স্বস্তিকা

দাম দশ টাকা

৭০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ২৩ এপ্রিল ২০১৮।। ৯ বৈশাখ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ৯ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৩ এপ্রিল - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সব দোষ কুচুটে সাংবাদিকদের ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : পঞ্চায়েত-হিংসার দায়ী বিজেপি ও দিলীপ ঘোষ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে পর্যটন চালিকাশক্তির ভূমিকা নিতে পারে ▯ অনুরাগ ঠাকুর ▯ ৮

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১১

এফ আর ডি আই ও নীরব মোদী ▯ অম্লান কুসুম ঘোষ ▯ ১৪

আগরতলা বইমেলায় স্বস্তিকা ▯ তাপস দত্ত ▯ ১৬

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : ব্যাণ্ড বাজা পঞ্চায়েত ▯ ১৭

অঙ্গনা : মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ▯ সৌমী দাঁ ▯ ২১

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এত অনিচ্ছা কেন? ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

মানুষ সুযোগ পেলেই মমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৫

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মুসলমানরা শুধুই ভোটার ▯ সুদীপ ঘোষ ▯ ২৭

আদালতের নির্দেশে গণতন্ত্রের জয় দেখছে বিরোধিরা ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৮

ভ্রমণ : বিনসরের দু'রাত ▯ বর্ণালী রায় ▯ ২৯

সনাতন ধর্মের স্তম্ভ আচার্য কুমারিল ভট্ট ▯ শুভ্রা দে ▯ ৩১

গল্প : সুযোগ ▯ মানসী রায় ▯ ৩৫

খেলা : কমনওয়েলথ গেমসে সফল ভারতীয়রা ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৪০

সোনার প্রতি মানুষের টান প্রাগৈতিহাসিক ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ অন্যরকম : ৪১ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪২▯ এই সময় ও সমাবেশ সমাচার : ৪৩-৪৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ষড়যন্ত্রের রাজনীতি

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আকাশচুম্বী সাফল্যে দেশের বিরোধী নেতারা সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন। সম্ভবত তখনই বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বীজ বোনা শুরু হয়েছিল। তারপর একের পর এক রাজ্যে বিজেপির সাফল্য এবং জাতীয় নায়ক হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর উত্থান তাদের অস্তিত্ব সংকটকে আরও অনিবার্য করে তুলেছে। সেই কারণেই নির্বাচনের আগে পরিকল্পনামাফিক দেশ জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। কখনও আকলাখ-কে নিয়ে, কখনও জিগনেশ মেভানিকে নিয়ে, কখনও বা দলিতদের সামনে রেখে সমাজকে অশান্ত করার অপচেষ্টা চলেছে সমানে। এখন আবার কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আসিফা ধর্ষণকাণ্ড। ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোনও ধর্ষণের নিন্দা করেও আসিফা ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপট এবং জাতীয় রাজনীতিতে তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং দীপক ঘোষ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

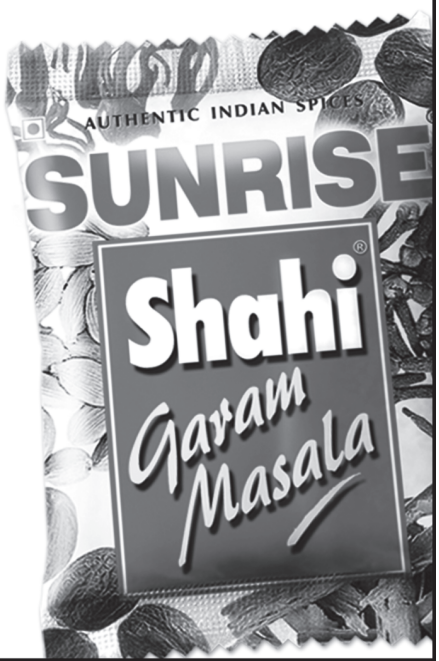

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

নস্যাৎ হিন্দু সন্ত্রাসতত্ত্ব

এন আই এ আদালতের রায়ে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণের প্রধান অভিযুক্ত অসীমানন্দ-সহ পাঁচজনকেই প্রমাণের অভাবে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে মালেগাঁও বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ, অজমেঢ় শরিফ সন্ত্রাসের মামলাতেও অভিযুক্তরা মুক্তি পাইয়াছেন। এগারো বছর আগে ২০০৭-এর ১৮ মে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ হয়। ইহার ফলে ৯ জন নিহত ও ৮ জন আহত হয়। সেই সময় রাজ্যপুলিশ এই বিস্ফোরণের জন্য হরকতুল জিহাদ গোষ্ঠীকে দায়ী করে। তবুও ওই বিস্ফোরণের পরই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তত্ত্ব তুলিয়া ধরেন ইউপিএ সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডে। প্রথমে সিবিআই এবং পরে এন আই এ এই মামলা লইয়া তদন্ত শুরু করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের পক্ষেও কিছু প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। এন আই এ-র চার্জশিটে বলা হয় ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে এই বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করা হয়। হিন্দু ধর্মস্থান কিংবা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদ্দিন বা হুজির মতো গোষ্ঠীগুলি লাগাতার বিস্ফোরণ ঘটাইবার পর পাল্টা প্রতিশোধ হিসাবেই হায়দরাবাদের চারমিনারের কাছে মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণের ছক কষা হইয়াছিল। সেই তদন্তের জেরেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তদের। কিন্তু চক্রান্তের পক্ষে কোনও নথিপত্র ও প্রমাণ পেশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এন আই এ।

একটি বিষয় উপেক্ষা করিলে চলিবে না যে, ১১ বছর আগে রাজ্য পুলিশ এই বিস্ফোরণের জন্য হরকতুল জিহাদ গোষ্ঠীকে দায়ী করিয়াছিল এবং এই কারণে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছিল। কিন্তু এই মামলার তদন্তের ভার তখন রাজ্য পুলিশের হাত হইতে সরাইয়া লইয়া সিবিআই-এর উপর দেওয়া হইয়াছিল। সিবিআই তদন্তের সূত্রে হিন্দু সংগঠনের কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এই সময় তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের তরফে হিন্দু সন্ত্রাস-এর তত্ত্ব তুলিয়া ধরা হয়। আজ বিরোধী পক্ষ হিসাবে কংগ্রেস যতই বলুক না কেন হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্বের সঙ্গে তাহাদের দলের কোনও সংশ্রব নাই, কিন্তু সত্য হইল কংগ্রেসেরই এক নেতা এই তত্ত্ব তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সেই সময় দল হিসাবে কংগ্রেস এই তত্ত্বের কোনও প্রতিবাদ করে নাই, বরং মৌন সম্মতি জানাইয়াছে। এই মামলায়, বিশেষত মালেগাঁও এবং অজমেঢ় শরিফে বিস্ফোরণে যেভাবে কংগ্রেস গৈরিক বা হিন্দু সন্ত্রাস-এর তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল, তাহা যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তদের সসম্মানে মুক্তি তাহারই প্রমাণ।

রাজনৈতিক লাভের জন্যই কংগ্রেস এই মিথ্যা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল। এখন কংগ্রেস তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাজকর্ম লইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে। কিন্তু ঘটনা হইল, এইসব ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাগুলির ব্যর্থতা নতুন নহে। জার্মান বেকারি ও সবরমতী এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ মামলাতেও অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। বিড়ম্বনার বিষয় হইল, রাজনৈতিক দলগুলি এইসব মামলার রায়গুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছে। নিজেদের সুবিধা মতো আদালতে রায়ের ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া বরং তদন্তকারী সংস্থাগুলি যাহাতে আরও কীভাবে সক্ষম হয় তাহার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। গৈরিক বা হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্ব এইবারও তাই আদালতের রায়ে নস্যাৎ হইয়া যাইল। বস্তুত গৈরিক বা হিন্দু সন্ত্রাস বলিয়া কিছু নাই।

সুভাষিতম্

পদাহতং যদুত্থায় মূর্ধানমধিরোহিত।

স্বস্থাদেবাসমানেঽপি দেহিনস্তদ্বরংরজঃ।।

পদাঘাতে জর্জরিত ধূলা মাথায় চড়ে যায়। অপমানিত হওয়ার পর যে চুপচাপ থাকে তার থেকে ধূলাও উৎকৃষ্ট।

সব দোষ কুচুটে সাংবাদিকদের

সত্যিই তো আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে তেমন কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। নির্বিঘ্নে শান্তিতে সব বিরোধী দলই মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। বিরোধী প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের চা মিষ্টি খাইয়েছেন শাসকদলের স্থানীয় মাস্তানরা। তবু বিরোধীরা খুশি নন। আসলে সবচেয়ে বদমায়েশ হচ্ছে কুচুটে সাংবাদিকরা। বিজেপির টাকা খেয়ে সাংবাদিকরা বানিয়ে বানিয়ে কাল্পনিক সংঘর্ষ, খুন ইত্যাদির ঘটনা লিখছেন এবং টিভিতে দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, এমনটাই সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। গত ১১ এপ্রিল নবান্নে তিনি বলেছেন, ''পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজ্যে মিথ্যা, কুৎসা ও অপপ্রচারের বেসাতি চলছে। তিলকে তাল করে টিভিতে দেখানো হচ্ছে। যা হয়নি তাও রটানো হচ্ছে। কুৎসার পরিবেশ তৈরিতে বিজেপির আর্থিক মদত রয়েছে। কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপি মিলে এখন তিন ভাই। কংগ্রেস, সিপিএমকে বলেছিলাম বিজেপিকে হারাতে একের বিরুদ্ধে এক নীতিতে প্রার্থী দিতে। ওরা আমার কথা শুনলো না। বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস-সিপিএম এই রাজ্যে জোট করেছে। সিপিএমের হার্মাদরা বিজেপিতে জুটেছে। পঞ্চাশ হাজার বুথের মধ্যে মাত্র সাতটি বুথে সামান্য মারামারি হয়েছে। বাকি সব বুথে শান্তিতে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। সন্ত্রাস হলে বিরোধীরা ৯০ হাজার মনোনয়নপত্র দাখিল করলো কীভাবে?'' দিদিগো, তোমার তুলনা নেই। দিদি নামজাদা লেখিকা। দিদি ছবি আঁকিয়ে। যদিও সারদা চিটফাণ্ডের মালিক জেলে যাওয়ার পর দিদির আঁকা ছবি একটাও বিক্রি হয়নি। দিদি মস্ত বড় গায়িকা ও গীতিকার। সময়ের অভাবে গান গাইতে পারেন না। দিদি একজন সর্বভারতীয় নেত্রী। তাঁর কথায় দেশের বিজেপি বিরোধী নেতানেত্রীরা ওঠেন বসেন। অথচ তাঁর নিজের রাজ্যের চুনোপুঁটি কংগ্রেস এবং সিপিএমের নেতারা 'জাগাই মাধাই' হয়ে বিজেপির কীর্তন গাইছে।

কুচুটে সাংবাদিকদের কুৎসা প্রচারে রাজ্যের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। বীরভূমের বীরপুত্র অনুব্রত মণ্ডল বলেছেন, আমার জেলার পথে পথে উন্নয়ন লাঠি-সড়কি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। উন্নয়নের নজরদারি এড়িয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যায় না। কথাটা

গূঢ়পুরুষের কলম

মিথ্যা নয়। এখানে জেলা পরিষদের ৪২টি আসনই বিনা লড়াইতে জিতেছে তৃণমূল প্রার্থীরা। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, দুই মেদিনীপুরের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পুরোপুরি বিরোধী শূন্য করবেন। মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের স্থান নেই। রাস্তায় রাস্তায় লাঠি বন্দুক নিয়ে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। মনোনয়ন পর্বেই চারটে লাশ 'উন্নয়ন' ফেলে দিয়েছে। ভোটের দিন বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সমর্থকরা বাড়ি থেকে বেরলে তার দায়িত্ব শাসকদলের উন্নয়ন কর্মীরা নেবে না। আবার বলছি, পশ্চিমবঙ্গে আজ কোথাও গণতন্ত্র বলে বস্তুটি নেই। সেকথাটা দিদির রাজত্বে প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে এবং বর্তমান কমিশনার এ.কে. সিংহ হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন এবং এখনও বুঝছেন।

সুদীর্ঘ বহু বছর সাংবাদিক জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বলছি যে, রাজ্যের সাংবাদিকদের আমি এতটা ভীত অসহায় অবস্থায় অতীতে দেখিনি। হ্যাঁ, বামফ্রন্টের আমলেও এতটা হেনস্থা সহ্য করতে হয়নি সাংবাদিকদের। সমস্ত রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় এলে সাংবাদিকদের পেটায়। কারণ, সাংবাদিকরা শাসকদলের নেতাদের রক্তচক্ষুকে ডরায় না। তাই শাসকদল বিরোধী বর্জিত ভোট নয়, সাংবাদিক বর্জিত ভোট চায়। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নপর্বে কত জন সাংবাদিককে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে তার হিসাব করা সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র খুন হয়ে গেলে তার হিসাব রাখে পুলিশ ও প্রশাসন। রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের আমলাদের দেহরক্ষী থাকেন। নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় পুলিশ ও প্রশাসন। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব কেউ নেয় না। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে রিপোর্টাররা কর্তব্যে অবিচল থাকেন। তবু দিদির রাজত্বে সাংবাদিকদের সামান্যতম সমাদর নেই। সাংবাদিক নিগ্রহ এখন তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়ে গেছে।

বিধাননগর পুরভোট (২০১৫), বিধানসভা ভোট (২০১৬), বামেদের নবান্ন অভিযান (২০১৭) প্রতিটিতে সাংবাদিকদের উপর বিনা কারণে লাঠিচার্জ করা হয়েছে। ক্যামেরা ভেঙেছে। মাথা ফেটে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বহু সাংবাদিক। টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে রাজ্যবাসী দেখেছেন পুলিশের নির্মমতা। ভয়াল মুখ। তবু একজন পুলিশেরও শাস্তি হয়নি। হবেও না। কারণ, প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নির্দেশ না থাকলে পুলিশ অতটা বাড়াবাড়ি করে না। বীরভূম জেলাকে বিরোধী মুক্ত করার ছককে সফল করতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিউড়ির জেলা পরিষদ ভবনে সাংবাদিকদের জন্য 'প্রেস কর্ণার' করে দিয়েছেন দিদি। ঘোষণা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত, দুঃস্থ, বৃদ্ধ, সাংবাদিকদের জন্য মাসিক ২৫০০ টাকা পেনশন। এতে সাংবাদিকদের প্রতি তাচ্ছিল্য জাগতে বাধ্য। বাস্তবে সেটাই হচ্ছে। আলিপুর ট্রেজারির সামনে জনৈক চিত্র সাংবাদিককে নগ্ন করে তৃণমূলের কেডাররা লাঠিপেটা করেছে সম্প্রতি। ট্রেজারির সামনে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি গোপন করা হয়েছে। নবান্নে দিদি অবশ্য বলেছেন, এমন কিছু হয়নি। সবটাই রটনা। অপপ্রচার। কুৎসা। ■

পঞ্চায়েত-হিংসায় দায়ী বিজেপি ও দিলীপ ঘোষ

মাননীয় দিলীপ ঘোষ
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি
৬, মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা

দিলীপবাবু,

রাজ্যে এত গোলমালের পরিবেশ কেন তৈরি করলেন? আপনি কেন এমন লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি করলেন! আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় হাত দিয়েছেন? মৌচাক চেনেন, মৌচাক? ভিতরে মধু থাকে, পাহারা দেয় মৌমাছিরা। একজন রানি মৌমাছি আর বাকিরা রানির চামচা, পাহারাদার।

এই রাজ্যের পঞ্চায়েত হচ্ছে মৌচাক। অনেক মধু। আর সেই মৌচাকে ঢিল মারলে মৌমাছি তো আক্রমণ করবেই। এতে মৌমাছিদের দোষ নেই, তারা তো নির্দেশ মানছে। ওটাই ওদের কাজ। অনু মৌমাছি কিংবা পরমাণু মৌমাছি তো নিমিত্তমাত্র। আপনি রানি মৌমাছিকেও খেপিয়ে দিয়েছেন। হুল ফোঁটালে সহ্য তো করতেই হবে। আগেই বলে দিচ্ছি, মৌচাকে ঢিল মারা কোনও শুভবুদ্ধির কাজ নয়।

ভোট নিয়ে এত যে লড়াই তাতে আসলটা তো হলো সেই মধু। যা শাসক দলের প্রাপ্য। সেটাই দলের রসদ, বেঁচে থাকার প্রাণ ভোমরা তো ওই পঞ্চায়েতেই। হিসেব বলছে প্রায় ১৫টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রতি বছর খরচ হয়। পঞ্চায়েত এখন 'টাকার খনি'। কেন্দ্রে মোদী সরকার এসে আবার সেই টাকার ফ্লো বাড়িয়ে দিয়েছে। এত এত প্রকল্প তাই অত অত টাকা। টাকা চুরিতে অনেকটা টাইট কেন্দ্র দিতে পারলেও, দিলীপবাবু, আপনার প্রধানমন্ত্রী সবটা পারেননি। একশো দিনের কাজে সরাসরি টাকা দিচ্ছেন শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কিন্তু সেখানে থেকে টাকা তুলে নেতাদের কমিশন দেওয়া তো বন্ধ করতে পারেননি।

সদ্য শেষ হওয়া আর্থিক বছর পর্যন্ত ৫ বছরে পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে ৫৯ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৩৩৪৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়ে ১৭.৭১ কোটি টাকা। মানে এক বছরে সাড়ে তিন কোটির বেশি। এর মধ্যে অন্তত ২ কোটি টাকা একজন গ্রাম প্রধান নিজের হাতে খরচ করেন। সেই মজাটা কেষ্টবাবুরা ছাড়বেন কেন? এমনিতেই কেষ্টবাবুর মাথায় নাকি কম অক্সিজেন যায়। টাকার অক্সিজেন কমে গেলে তো অনুব্রতদের ক্ষমতা অনু সমান হয়ে যাবে! এবার বুঝেছেন দিলীপবাবু কেন আপনার ভুল হয়েছে! সাপের ল্যাজে পা দিলে সাপ তো ফোঁস করবেই। তার উপরে দুধ-কলায় অভ্যস্ত সাপের ভাত মারার চেষ্টা। এটা ভালো হচ্ছে না দিলীপবাবু।

পঞ্চায়েত মানে ১০০ দিনের কাজ, চতুর্দশ অর্থ কমিশন, পঞ্চায়েত সশক্তিকরণের বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা, নানাবিধ ভাতা-প্রাপকের তালিকা তৈরি, বাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও জল-রাস্তা-বিদ্যুতের তালিকা বিশাল। তাই তো রাজ্যের বুদ্ধিমান মন্ত্রী অধিকারীবাবু বলেই দিয়েছেন বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত দিতে পারলে এক্সট্রা ৫ কোটি টাকা। মানে বিরোধীশূন্য করতে পারলে হাতে প্রায় ২৩ কোটি টাকা। ছাড়া যায় নাকি বলুন তো!

সুতরাং, ভোট-ফোট করতে দেওয়া যাবে না। যেন তেন প্রকারেণ অমৃতের ভাণ্ড দখলে রাখতেই হবে। দেবাসুরের লড়াই হোক, তবু সেটা ছাড়া যাবে না। আপনি কটা রাহুকে বধ করবেন? কোনও অবস্থাতেই ফের ভোটে গিয়ে জিতে আসার পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। মারদাঙ্গা করে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত চাই।

আর রানি মৌমাছি মানে আমাদের দিদি, মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের একমাত্র নেত্রী বলে দিয়েছেন বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত চাই। একটি বড় নেতা হিসেবে এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে, বাকি মৌমাছিদের কর্তব্য পালন করাই কর্তব্য!

কথায় বলে, মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আপনি দুটোই বের করে দিয়েছেন। মুখে চ্যালেঞ্জ আর মৌচাকে ঢিল। এখন রক্ত ঝরলে দোষ দেবেন না প্লিজ।

মেনে নিন আর লড়ে যান।

—**সুন্দর মৌলিক**

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে পর্যটন চালিকাশক্তির ভূমিকা নিতে পারে

অতিথি কলম

অনুরাগ ঠাকুর

''যদি আমায় কেউ জিজ্ঞেস করেন যে পৃথিবীর কোন আকাশসীমার অন্তর্গত ভূমিখণ্ডে মনুষ্য জাতির সর্বাপেক্ষা শ্রেয়তর গুণগুলি প্রস্ফূটিত হয়েছিল, আমি নির্দ্বিধায় ভারতের নাম বলব।'' কথা ক'টি বলেছিলেন প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেব। হয়তো ভারতীয় চিন্তা মনীষার চরম উৎকর্ষের ফলেই এই ভারতভূমি কোনও সময় ভরে উঠেছিল নয়নাভিরাম স্থাপত্যকলার নির্মাণে, বর্ণময় নানান উৎসবের প্রাচুর্যে বা দীর্ঘ সময় লালিত ঐশ্বর্যময় অতীত সংস্কৃতিতে।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ভারতের এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই, তাই বিদেশিরা আর কতটা জানবে। এই প্রসঙ্গে আমার দৃঢ় বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়িই সরকারের তরফে একটি উপযুক্ত পর্যটন পরিকল্পনাকে ঠিকভাবে বাস্তবরূপ দেওয়া দরকার যাতে অতুলনীয় ভারত-২ দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প আজ অন্যতম একটি বড় ক্ষেত্র। বিশ্ব জিডিপির শতকরা ৯ শতাংশ পর্যটনের অধীন। বিশ্বে এই ক্ষেত্রে ২০ কোটি চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। বোঝাই যায় যে পর্যটন ক্ষেত্র আজ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। উৎপাদন শিল্প, চিকিৎসা ক্ষেত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি যেমন সরকারি, বেসরকারি ও মিডিয়ার আনুকূল্য পেয়ে থাকে, ঠিক সমপরিমাণ মনযোগ এখন পর্যটনও দাবি করে। ভারতের ক্ষেত্রে পর্যটন সেই অর্থে একটি 'গেম চেঞ্জার' ক্ষেত্র হবার সম্ভাবনাময়। কেন্দ্রের মোদী সরকার বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন বলেই সবরকমভাবে তাঁরা পর্যটনকে বাড়তি মদত দিতে চান। বিদেশিদের ক্ষেত্রে পৌঁছনোমাত্র চটজলদি ভিসা প্রদান, ই-ভ্রমণকারী ভিসা দেওয়া, দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটক আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা, সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন সংক্রান্ত যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে কেন্দ্রের তরফে সেগুলিকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করার চেষ্টা আগেই শুরু হয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রধানমন্ত্রী যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালু করেছেন, দেশকে পর্যটকদের চোখে আকর্ষক করে তুলতে তার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

মানতেই হবে সড়ক পর্যটনের ক্ষেত্রে ও বিমান পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নে দেশে এই সরকারের আমলে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। যার ফলে পর্যটন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি নজরে পড়ছে। পরিসংখ্যান দিলে বোঝা যাবে যেখানে সারা বিশ্বে পর্যটন শিল্পে বৃদ্ধি ঘটেছে ৪ শতাংশ ভারতে সেখানে ২০১৬ সালে বিদেশি পর্যটকের আগমনের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটেছে ৯.৭ শতাংশ। পর্যটন ক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রায় আয় ৮.৮ শতাংশ, বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু যদি আমরা পর্যটনকে অর্থনীতির উন্নয়নের একটি চালিকাশক্তির ভূমিকায় উন্নীত করতে চাই সেক্ষেত্রে ঠিক জিএসটি কাউন্সিলের মতো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ভিত্তিক সংস্থা নির্মাণ জরুরি। জিএসটি কাউন্সিলের সাফল্য আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঠিক সেই রকম সারা ভারতের প্রতিনিধি নিয়ে সংস্থা তৈরি করতে পারলে দেশের উন্নয়নকল্পে যে কোনও বড় কাজ করা যেতে পারে, যেমন পর্যটনের প্রসার।

এই সুত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত কাউন্সিল গঠন করা দরকার। এটির নাম Sustainable Tourism Interventions Council। আমি সংসদে Private Member Bill হিসেবে National Tourisim Bill 2018 কে পেশ করতে চাই। এই প্রস্তাবিত কাউন্সিলে থাকবেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী, সমস্ত রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীরা, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিদ্বজ্জনেরা এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্তাব্যক্তিরা। হ্যাঁ, নতুন করে আরও একটি সরকারি সংস্থা স্থাপন করার মধ্যে অনেকেই হয়তো লাল ফিতের ফাঁসের কথা ভাবছেন। কিন্তু না সেটি হবে না। কেননা এটিও গঠিত হবে ঠিক জিএসটি কাউন্সিলের ধাঁচায় সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে। দেশের বহু রাজ্যেই যথোপযুক্ত পর্যটন সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র বা উপযুক্ত অর্থবল কোনওটাই নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরির ফলে কেন্দ্রের ও বিভিন্ন রাজ্যগুলির সঙ্গে মত বিনিময় ও তাদের কাছ থেকে কৃৎকৌশল আদান প্রদান করে দুর্বল রাজ্যগুলিও প্রয়োজনীয় উন্নতি করে একটি শক্তিশালী পর্যটন শিল্পের সূচনা করতে পারে। এর ফলে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি রাজ্যের সঙ্গে আর একটি রাজ্যের পারস্পরিক পর্যটনে আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এই সূত্রে বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৫টি করে রাজ্যকে বেছে নিয়ে তাদের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করতে পারে। এমনকি রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে জেলাস্তর অবধি নেমে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা রাজ্যগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাকশান প্ল্যান নির্ধারণও করতে পারে।

আমার নিজের রাজ্য হিমাচল প্রদেশে আমি দেখেছি পর্যটকরা বরাবর ডালহৌসি, ধর্মশালা, সিমলা, কুলুমানালির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছেন। এখানে ভয়ঙ্কর ভ্রমণার্থীর চাপ যা নিত্যদিন বাড়ছে। অথচ আরও সুন্দর সুন্দর পর্যটক আকর্ষণের স্থান যেমন কাজা, পাঙ্গি বা লাহুল স্পিতিতে

কারুর নজরই নেই। সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটিয়ে পরিকাঠামোয় প্রয়োজনীয় রদবদল এনে অনায়াসে এই স্থানগুলির ওপর পর্যটকদের নজর ঘোরাতে পারে। এর ফলে মাত্র কয়েকটি অতি জনপ্রিয় জায়গার ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ কমবে। এই সূত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি, কেননা তারা দীর্ঘ পর্যটন অভিজ্ঞ হওয়ায় নিত্য নতুন উদ্ভাবনে অনেক পারদর্শী। সঙ্গে সঙ্গে তারা চাকরিও তৈরি করে দিচ্ছে।

পর্যটন শিল্পের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মানব সম্পদ, এই কারণেই প্রস্তাবিত বিলটিতে Skill enhancement Certification Agency নামে সংস্থা তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই এসইসিএ সেই সমস্ত সংস্থা যারা বিভিন্নভাবে তরুণ- তরুণীদের বিভিন্ন মানদণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। একেবারে নির্দিষ্ট করে পর্যটন শিল্প নির্ভর প্রশিক্ষণই বলা যেতে পারে। যেমন পর্যটকদের জন্য গাইড তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া, যেহেতু বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা আসেন তাই যাঁরা নানা বিদেশি ভাষা বা সেইসব দেশের জনপ্রিয় রান্না সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেন তাদের সব কাজে সরকারি সহায়তা করবে। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত নতুন সংস্থা স্থাপনও করবে।

তবে এ প্রসঙ্গে পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমস্ত দিকগুলিও মাথায় রাখা দরকার। যেমন— পর্যটকের বৃদ্ধি ঘটলে পরিপূরক হিসেবে যানবাহনেও বৃদ্ধি ঘটবে। ইউএনডব্লিউটিও-এর সমীক্ষা অনুযায়ী এখনই পর্যটন শিল্প বিশ্বের CO_2 দূষণের ৫ শতাংশ ঘটিয়ে থাকে। এটি মূলত যানবাহন ও হোটেলের জ্বালানিজনিত কারণে। এছাড়া দেখা যাচ্ছে বহু ভ্রমণ গন্তব্যই পর্যটকদের ফেলা বর্জ্য ও প্ল্যাস্টিকের আবর্জনায় প্রায়শই ভরে যায়। আবার এও দেখা গেছে অনেক সময় স্থানীয়দের সঙ্গে ভিনদেশি সংস্কৃতির ভ্রমণার্থীদের পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ন্যঞর্থক প্রভাবকে আটকাতে বিলটিতে নানান প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে পর্যটনের নেগেটিভ এফেক্ট যতটা সম্ভব কমানো যায়। পর্যটনের মার্কেটিং ও এর বিজ্ঞাপনী প্রসারণের দিকটিকে প্রায়শই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অতুলনীয় ভারত বা Incredible India-এর নজরকাড়া সাফল্যের ফলে দেশে ভ্রমণার্থীর আগমনে যে বড় সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে তার পিছনে রয়েছে সফল প্রচারের ভূমিকা। নির্দিষ্টভাবে প্রচারের দিকটির হাল ধরতে বিলে একটি মার্কেটিং ট্যাক্স ফোর্স তৈরির সুযোগ রাখা হয়েছে যার নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, যাঁর থাকবে মার্কেটিং ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ। এই সরকারি আধিকারিক দলের কাজই হবে চিরাচরিত পর্যটনের স্পটগুলি থেকে নতুন নতুন সাজিয়ে তোলা স্থানগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলে সেদিকে পর্যটকদের পাঠানো। একই সঙ্গে তাঁরা বাড়তি পর্যটক সংগ্রহের দিকেও জোর দেবেন।

> **যেখানে সারা বিশ্বে পর্যটন শিল্পে বৃদ্ধি ঘটেছে ৪ শতাংশ ভারতে যেখানে ২০১৬ সালে বিদেশি পর্যটকের আগমনের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটেছে ৯.৭ শতাংশ। পর্যটন ক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রায় আয় ৮.৮ শতাংশ, বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ মিলিয়ন ডলার।**

বিলটিতে বর্তমানে রাজ্যে রাজ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে যেমন 'case of doing bussiness' -এর ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে 'case of doing tourism'-এর বেলাতেও একই প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করার ধারা রাখা হচ্ছে। অত্যন্ত উদ্ভাবনী পরিকল্পনার পরিচয় দিয়ে বিলে একটি Heritage Fund তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনে ঐতিহ্যপূর্ণ সৌধ আবাস বা অন্যান্য পর্যটক উপযোগী অঞ্চলকে চিহ্নিত করে তা অধিগ্রহণ করতে সুবিধে হবে। উদাহরণ স্বরূপ লন্ডনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের বাড়িটি কিনতে সরকার সচেষ্ট হতে পারে। দেশকে পর্যটকদের চোখে আকর্ষণীয় করে তুলে তাদের কাছে ভারতের মহিমাকে প্রদর্শন করার পরিকল্পনার প্রধান পুরোহিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই National tourism bill সেই লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যাতে পর্যটন শিল্প একটি দীর্ঘমেয়াদী সফল প্রচেষ্টা হিসেবে টিঁকে থাকতে পারে।

ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে যাঁরাই ভারতকে চিনতেন, জানতেন তাঁরাই এদেশে আসার জন্য উন্মুখ হতেন ও সুযোগ পেলেই এখানে আসতেন, প্রত্যেকেরই আসার ভিন্ন ভিন্ন কারণ ছিল। যাঁরা ভারত ইতিহাস অন্বিসন্ধিৎসু ছিলেন তাঁদের চির অতৃপ্ত মন এখানে ছুটে আসত। ব্যবসায়ী শ্রেণী আসত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। অন্যান্য আরও বহু পেশার মানুষের কাছে এ দেশ ছিল স্বর্গ সুষমায়।

এখন আবার সময় এসেছে দেশকে পর্যটকদের কাছে ঠিক সেই রকম আকর্ষণীয় করে তোলার। ■

ডেঙ্গু প্রতিরোধে আয়ুর্বেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ডেঙ্গু প্রতিরোধে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আগামী বছর গোড়ায় এই ওষুধ বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। দ্য সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদিক সায়েন্সেস (সিসিআরএএস) ওষুধটি পরীক্ষা করে শংসাপত্র জারি করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় এই ওষুধ ব্যবহার করলে কোনও ক্ষতি হবে না। সিসিআরএএস-এর ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক বৈদ্য কে. এস ধীমান জানান, সারা বিশ্বে স্বীকৃত ডবল ব্লাইন্ড প্ল্যাকেবো নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার পর ওষুধটিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পরীক্ষায় জীবন্ত মানবশরীর ব্যবহার করা হয়। কে. এস ধীমান বলেন, এই ওষুধে এমন সাতটি ভেষজ ব্যবহার করা হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে আসছেন। সাম্প্রতিক কয়েকটি বছরে ডেঙ্গুকে সারা ভারতের অন্যতম মারণরোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞেরা। এই রোগের কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে ডেঙ্গুর কবলে পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। ২০১৭ সালে ১,৫৭,২২০টি ডেঙ্গু সংক্রমণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে ২৫০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারে আশার আলো দেখছেন চিকিৎসকেরা।

উবাচ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

“প্রতিদিন আমি এখানে (নবান্নে) আসি কাজ করতে। কিন্তু ঠিক করেছি, কাল থেকে দিনের প্রথম অর্ধে আমি আর এখানে আসব না। আমার নিজের কাজকর্ম সেরে দ্বিতীয়ার্ধে আসব।”

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আনা পিটিশন কলকাতা হাইকোর্ট খারিজ করে দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায়।

রেখা শর্মা
চেয়ারপার্সন, জাতীয় মহিলা কমিশন

“দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক নন। রাজ্য প্রশাসন চেষ্টা করে যাচ্ছে যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁরা এবং আক্রান্তরা যেন জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে যেতে না পারেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি ওই ১০৫ দিন কী হয়েছিল। মহিলাদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অমানবিক ঘটনা।”

দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক তাঁর সঙ্গে দেখা না করার পরিপ্রেক্ষিতে।

ইন্দ্রেশ কুমার
আহ্বায়ক, মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ

“কোনও বিতর্কিত স্থানে মসজিদ তৈরি করা যায় না। ভগবান রামের জন্মস্থান অযোধ্যার মতো বিতর্কিত জায়গায় মসজিদ সম্ভবও নয়। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতেও রামজন্মভূমিতে ইসলামের কোনও নিদর্শন মেলেনি। বরং মন্দিরের নিদর্শন মিলেছে।”

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে।

সাইনা নেহওয়াল
ক্রীড়াবিদ

“আমার কাছে এই জয় অলিম্পিকে পদক জেতা এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ-এ প্রথম হওয়ার পরেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।”

কমনওয়েলথ গেমস-এ ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলসে স্বর্ণপদক জয়ের পর।

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি

প্রবাল চক্রবর্তী

বছর পাঁচেক আগের কথা। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট'-এ ভাষণ দিতে এসেছিলেন বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশানাল ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন ডিরেক্টর (বর্তমানে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) অজিত দোভাল। বিষয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ। উনি বলেছিলেন, ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর পাশ্চাত্যের দেশগুলো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু করেছিল। এত বছর হয়ে গেল, সেই যুদ্ধ আজও চলছে। কেউ কি বলতে পারবে, ২০০১ সালের তুলনায় আমরা আজ বেশি নিরাপদ আছি? আমেরিকা বলেছিল, সন্ত্রাসীদের যাবতীয় নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে ফেলা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ আজও বেঁচে আছে, আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ভুলটা কোথায় হচ্ছে? দোভাল বলেছিলেন, ভুলটা আমাদের চিন্তাধারায়। আমরা শত্রুকে আমাদের নিজেদের মতোই ভাবি। আমেরিকার সামরিক বাহিনী যদি মাইনে না পায়, অস্ত্রশস্ত্র না পায়, যদি তাদের চেইন-অব-কমান্ড নষ্ট হয়ে যায়, তবে নিশ্চিত তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। আমেরিকা ভেবেছিল, এই ব্যাপারটা আল-কায়দার ক্ষেত্রেও সত্যি। তাই প্রথমেই ওরা সন্ত্রাসীদের প্রথম সারির নেতৃত্বকে মেরে ফেলল, অস্ত্রশস্ত্র আর টাকাপয়সার জোগান বন্ধ করে দিল। তবু সন্ত্রাসবাদ বেঁচে রইল। কারণ, যে রোগের যে ওষুধ, সেই ওষুধ প্রয়োগ না করে যদি অন্য ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তবে রোগ ধ্বংস হয় না। দোভালের দাওয়াই, সন্ত্রাসের রোগটাকে শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকে বঞ্চিত করতে হবে। তবেই মরবে এই রোগ।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূল করতে দোভালের প্রথম নিদান, সন্ত্রাসীদের সংগঠিত হবার জায়গা দিলে চলবে না। আফগানিস্তানে হামিদ কারজাইয়ের উপজাতি ফৌজ আর আমেরিকান সেনা যখন আল-কায়দা ও তালিবানদের তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল, বাকি একদিক সামলানোর দায়িত্ব আমেরিকা দিয়েছিল পাকিস্তানকে। পাকিস্তান সেই সুযোগে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়েছিল। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল তাদেরকে। সন্ত্রাসের শিকড় তাই নির্মূল হয়নি। দোভাল বলেছিলেন, যতদিন সন্ত্রাসীরা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নিরাপদ আশ্রয় পাবে, ততদিন সন্ত্রাস নির্মূল হবে না। তাই সীমান্তের পরোয়া করলে চলবে না, সন্ত্রাসীদের ঘরে ঢুকে তাদেরকে শেষ করতে হবে। দোভালের দ্বিতীয় আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াই, সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে তাদের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠভূমিকে, তাদের মতাদর্শকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কারণ, যতদিন এদের মতাদর্শ অক্ষত আছে, এরা টাকাপয়সা বা আশ্রয় ঠিকই জুটিয়ে ফেলবে।

> "কন্ডোম কবিরা বলবেন, ধর্মে ধর্মে এই ভেদাভেদ কেন? নজরুল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। হুঃ! আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব হলো, মুসলিম তাঁর নয়ন মণি, হিন্দুর যায় প্রাণ। সেটাই তো দেখছি আমরা বারবার। ধূলাগড়ে, বাদুড়িয়ায়, আসানসোলে, সর্বত্র। আফজারুল মরলে লাখ লাখ, আর হেমন্ত মরলে ব্যাড লাক!"

এতদিন পরে কথাগুলো কেন মনে পড়ল? বলছি।

ভারতের স্বাধীনতা বহুলাংশে অনুশীলন দল ও যুগান্তর— এই দুই সংগঠনের কাছে ঋণী। স্বাধীনতার পর এই দুই সংগঠনের সদস্যরা অনেকেই বামপন্থী হয়ে গেছিলেন। দেশভাগের জন্য ওঁরা কংগ্রেসকে দায়ী করেছিলেন। ভেবেছিলেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে বামপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ওঁরা খেয়াল করেননি, দেশভাগে বামপন্থার কৃতিত্ব কংগ্রেসের থেকে কিছু কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল। সেই বাম আজ বিবর্তনের মাধ্যমে হয়ে দাঁড়িয়েছে সুপারবাম। পুরোনো দিনের অনেক বামপন্থীই আজকাল এইসব সুপারবামপন্থীদের দেখে লজ্জায় অধোবদন হন। দুনিয়া জুড়ে এই সুপারবাম ইসলামিক উগ্রবাদের প্রধান সহযোগী, ওয়াহাবিদের পরম মিত্র। এরা উভয়েই আরব দুনিয়ার খনিজ তেলের টাকায় পুষ্ট। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের নামিদামী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল বামপন্থা চর্চার আখড়া। আজ তাই বাংলার সাংবাদিকদের মধ্যে সুপারবামপন্থার এত প্রভাব খনিজ তেলের

টাকায় পুষ্ট এদের প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু মিথ্যারই বেসাতি করে। এদের কাণ্ডকারখানা দেখে শকুনরাও লজ্জা পায়। রানীগঞ্জ-আসানসোলে যে-কটি মৃত্যু ঘটেছে, এরা তার মধ্যে একটি লাশকেই খবরের যোগ্য মনে করেছে। দুদিন ধরে যে হিন্দুদের লাশ পড়েছে, এরা সেটাকে খবরের যোগ্য মনে করেনি। যেই একটি মুসলমান ছেলের মৃত্যু হয়েছে, শকুনের মতো এরা ঝাঁক বেঁধে এসে জুটেছে। কাগজে আর কোনও খবরই নেই দিনের পর দিন। পুত্রহারা ইমামের ঘামের গন্ধ এখন দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। যেন বাকি মৃতদেহগুলোর কোনও বাবা-মা নেই। উদ্দেশ্য? হিন্দুদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগানো। যাতে ভবিষ্যতে হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থেও অস্ত্র না ধরে। যার ফলে আরেকটা নোয়াখালি ঘটবে। জেহাদিদের আগ্রাসন যেন একতরফা হয়, এটাই এদের কাম্য। তারপর এরা বলবে, হিন্দুরা ভীতু কাপুরুষ, আত্মরক্ষার্থে অসমর্থ। মুসলমানরা সাহসী বীর। তাই হিন্দুরা, বাঁচতে চাও তো ইসলাম কবুল করো। অনেকটা এরকমই প্রোপাগান্ডা হয়েছিল স্বাধীনতার প্রাক্কালে। আবার হবে। এরা তাই চাইছে।

কন্ডোম কবির ভক্তদের আজ অনেক শুভেচ্ছা জানাই। চালিয়ে যান। ভালো থাকুন। আসনাসোল? সেটা কোথায়? বাংলার মধ্যে কি? হলেই বা কী? আমরা তো আসানিতে সোলে শান দিয়ে থাকি। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, আসানিতে সেটার দুই-তৃতীয়াংশ খুইয়েছি, দিব্বি জুতোর সোলে শান দিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি পিতৃ-পিতামহের ভিটেমাটি আমবাগান নারকোলবাগান পুকুরপাড় ছেড়ে। বাঙালি হিন্দুর শেষ আশ্রয়ভূমি বাকি বাংলাটাকেও শিগগিরই খোয়াবো। তাতে কী আর আসে যায়? হিন্দু থাকলেই বা কি, আর মুসলমান হলেই বা কী? ভারতে থাকলেই বা কী, আর পাকিস্তান-বাংলাদেশে গেলেই বা কী? এসবে কী আসে যায়? আমরা সবাই তো মানুষ!

হ্যাঁ, আপনার মতো পরজীবী স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের কিছু আসে যায় না জানি। ভবিষ্যতের কাছে আপনাদের তো আর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু আমাদের? আমরা যারা সাধারণ মানুষ, সেই আমরা তো আর অতীতের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখে চোখ বুজে থাকতে পারি না। ভবিষ্যতকে কী বলবো তাহলে?

কন্ডোম কবিরা বলবেন, ধর্মে ধর্মে এই ভেদাভেদ কেন? নজরুল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। হুঁঃ! আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব হলো, মুসলিম তাঁর নয়ন মণি, হিন্দুর যায় প্রাণ। সেটাই তো দেখছি আমরা বারবার। ধূলাগড়ে, বাদুড়িয়ায়, আসানসোলে, সর্বত্র। আফজারুল মরলে লাখ লাখ, আর হেমন্ত মরলে ব্যাড লাক!

সে যাই হোক, যেটা বলছিলাম। কে হিন্দু, আর কে হিন্দু নয়, তাতে কী আর আসে যায়? হ্যাঁ, আসে যায়। একটা উদাহরণ দিই? সম্প্রতি দুবাইয়ের পুলিশপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধাহে খালিফান বলেছেন, ভারতীয়রা কত নিষ্ঠাবান, কত শান্তিপ্রিয়, আইন মেনে চলে তারা সবাই। পাশাপাশি পাকিস্তানিদের দেখো, যতরকম বেআইনি কাজ করে বেড়ায় দুবাইতে। উনি দুবাইয়ের নাগরিকদের বলেছেন, পাকিস্তানিদের চাকরি না দিতে। ওঁর পরামর্শ, পাকিস্তানি ও বাঙালিদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে চরম সতর্কতা বিধেয়। শুনে চমকে গেলাম। পাকিস্তানি বুঝলাম, কিন্তু বাঙালি? পরে বুঝলাম, বাঙালি মানে ওরা বোঝে, বাংলাদেশি। আর আমরা যারা এপারের বাঙালি, তাদের ওরা শুধু ভারতীয় বলেই বোঝে।

তার মানে, দুবাইতে ভারতীয় বাঙালি স্বাগতম, বাংলাদেশি বাঙালি দূর হটো।

ওপারের বাঙালি আর এপারের বাঙালিতে তফাৎটা কী বলুন তো? একটাই তো তফাৎ, সেটা ধর্মে। তার মানে এটাই তো দাঁড়াচ্ছে, বাঙালি হিন্দু থাকলে তার আচরণ আদর্শ, আর সে মুসলমান হলেই হয়ে দাঁড়ায় অপরাধপ্রবণ। একথাটা কোনও হিন্দু নেতা বললে তো সারা দেশে আগুন জ্বলে যেত। কিন্তু বলেছেন দুবাই পুলিশের প্রধান। তাঁকে তো আর 'ইসলাম-বিরোধী', 'সাম্প্রদায়িক' এসব আখ্যা দেওয়া যাবে না। তিনি আরবের শেখ, মহানবির মুল্লুকের লোক, তাই কিল খেয়ে কিল হজম করতে হবে।

বাংলাদেশের এটাই তো ভবিতব্য ছিল। যে জাতি নিজের আত্মপরিচয় ভুলে যায়, তার এই হাল হয়। শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচে না। যারা সানন্দে নিজেদের শিকড় কেটে উদ্বাহু হয়ে নাচে, তাদের পিশাচ দশা প্রাপ্তি কে আটকাবে? আরবের মুসলমানরা কিন্তু তাদের প্রাক- ইসলামিক ইতিহাসকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করে। বাঙালি মুসলমানরা শিখেছে তাদের প্রাক-ইসলামিক ইতিহাসকে ঘৃণা করতে। শিখেছে হিন্দু পূর্বজদের, তাদের সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে। তাই তার এই পরিণতি। আর এদের জন্য পৃথিবী জুড়ে 'বাঙালি' নামটাই বদনাম হয়ে যাচ্ছে, লজ্জা, কী লজ্জা।

বাঙালি হিন্দুর সামনে এটা একটা সতর্কীকরণ। সম্মানের সঙ্গে বাঁচার একমাত্র পথ, হিন্দুত্বকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা। হিন্দুভাব যদি শিথিল হয়ে, তবে আমাদেরও হাল পূর্বপারের আমাদের ওই আত্মবিস্মৃত ভাইবোনগুলোর মতোই হয়ে দাঁড়াবে। না ঘরের না বাইরের, না ভারতের না আরবের, দুইয়ের মাঝে আটকে যাওয়া এক স্মৃতিভ্রংশ অপরাধপ্রবণ সমাজ হিসেবেই বাঙালিকে জানবে আগামী যুগ।

বাঙালি মুসলমানকে তার প্রাক-ইসলামিক ইতিহাসকে ঘৃণা করতে শেখালো কারা?

সৌদি রাজারা এককালে ছিল ওয়াহাবিদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। খনিজ তেল বিক্রির টাকা তারা দেদার খরচ করত পৃথিবী জুড়ে গোঁড়ামি রপ্তানি করতে, দুনিয়ায় ওয়াহাবি ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাদেরই টাকায় বোরখা-টুপির এত বাড়বাড়ন্ত। তাদেরই টাকায় ম্যানহাটান থেকে ম্যানিলা পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ওয়াহাবি

উগ্রবাদীদের জাল। বাংলার গণ্ডগ্রামে গড়ে উঠেছে আলিশান মসজিদ। যে গ্রামে লোকের মাথার ওপর ছাদ জোটে না, সেখানে দোতলা তিনতলা মসজিদ মাদ্রাসা গড়ে ওঠে কার বদান্যতায়? কেউ জিজ্ঞেস করেনি সেকথা। কারণ যাদের সেকথা জিজ্ঞেস করার কথা, সেই সংবাদ-মাধ্যমগুলোও তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওয়াহাবিদেরই টাকায় জারিত।

সেই সৌদি আরবে এক অদ্ভুত সময় উপস্থিত হয়েছে আজ।

'শেল অয়েল' প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর থেকেই পৃথিবী জুড়ে তেলের দামে মন্দা এসেছে। চাহিদার থেকে জোগাড় অনেক বেশি। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, তেল উৎপাদনে যা খরচ, বিক্রি করে সে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন কী হবে? লাভের টাকা না থাকলে ওয়াহাবিদের কী জুটবে? বিশ্বজুড়ে যে ওয়াহাবি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, টাকার জোগান বন্ধ হলে তারা ক্ষেপে উঠবে। তখন তারা ভস্মাসুরের মতো স্রষ্টাকেই ধ্বংস করতে যাবে। সেই ভয়ে সৌদি যুবরাজ আগেভাগে উদ্যত হয়েছেন ওয়াহাবিদের সংহারে। শোনা যাচ্ছে, বহু সৌদি রাজকুমারকে তিনি গৃহবন্দী করে রেখেছেন, যাতে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে ওয়াহাবিরা তাদেরকে ব্যবহার করতে না পারে। ইজরায়েল ওয়াহাবিদের ঘোষিত চিরশত্রু। সৌদি যুবরাজ ইজরায়েলের অধিকারকে স্বীকার করেছেন। ভারত থেকে ইজরায়েলগামী প্লেনগুলোকে সৌদি আকাশসীমা ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। খুব শিগগিরই হয়তো ইরজায়েলের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্কও গড়ে উঠবে সৌদির। ক'বছর আগেও এটা ভাবা যেত না। যুবরাজ বলেছেন, আরবরা কখনোই চায়নি ওয়াহাবিদের বাড়বাড়ন্ত, এসব তো ওদের আমেরিকার কথায় করতে হয়েছিল। মানেটা এটাই, সৌদি এখন ওয়াহাবিদের ছেঁটে ফেলবে ঠিক করেছে। এই প্রথম সেদেশে মেয়েরা গাড়ি চালানোর অনুমতি পেয়েছে। মেয়েরা বোরখা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে। শুধু তাই নয়, সেই দৃশ্য তারা ভিডিও রেকর্ডিং করে ছড়িয়ে দিচ্ছে ইন্টারনেটে। একই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ইরানেও। তেহরানে চৌমাথায় জড়ো হয়ে মেয়েরা বোরখা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বোরখা ত্যাগ হয়ে উঠছে প্রতীকী জন-আন্দোলন।

আরবে, ইরানে মেয়েরা বোরখা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আর বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে দিনে দিনে মেয়েদের ওপর বোরখা চেপে বসেছে আরও বেশি করে। হুমায়ুন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' সিনেমাটা দেখেছেন কি? সিনেমাটা দেখলে খেয়াল করবেন, সেযুগের ঢাকার পথেঘাটে বোরখা পরিহিত মহিলা প্রায় দেখাই যেত না। সেটা একাত্তর সালে, পাকিস্তানি শাসন। আর আজ? স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার পথেঘাটে শুধুই বোরখা-টুপি-দাড়ির মেলা। কেন? এর মূলে আছে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের মাথায় ফেজটুপি, মুখমণ্ডলে গোঁফবিহীন দাড়ি, কপালে কালো দাগ, পরনে খাটো পাজামার সঙ্গে লম্বা ঝুলের জামা। আমজনতা এদের বলে 'হুজুর'। ওয়াহাবি নেটওয়ার্ক এদের খরচাপাতি জোগায়। রক্তবীজের মতো এরা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও। সন্ধ্যাবেলায় মুসলমান মহল্লায় মজলিস বসায় এরা। মুসলমানদের বলে, টুপি-দাড়ি-বোরখা না পরলে সাচ্চা মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমান হতে গেলে হালাল খেতে হবেই। এরা বলে, ইসলাম বাদে বাকি সব ধর্মই নিকৃষ্ট, কুসংস্কার বিশেষ। আর হিন্দুধর্ম? সেটা তো ব্যভিচার। বানিয়ে বানিয়ে রকমারি গল্প বলে এরা। মিথ্যে পুরাণ থেকে কাল্পনিক উদ্ধৃতি দেয়, হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করতে। সেসব শুনে বিশ্বাস করে হিন্দুরা বলে, ইসলাম কবুল। আর মুসলমানরা বলে, রামনবমীর মিছিল বের করেছে যতসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর দল, চল ওদের ঠ্যাঙাই। দুই বাংলা জুড়ে হিন্দু নিধনের মূলে আছে এই হুজুররাই। রোগের চিকিৎসা না করে রোগ দূর করা যায় না। ওপার বাংলা তো গেছে। এপার বাংলাকে বাঁচাতে গেলে তাকে এই হুজুরদের হাত থেকে নিরাপদ করতে হবে।

অনুশীলন-যুগান্তরের যুগে আমরা জানতাম, কে শত্রু কে মিত্র। আজ শত্রুমিত্র গুলিয়ে যাচ্ছে, কারণ সেটাই ওদের উদ্দেশ্য। তাই ইমামের ছেলে মারা গেলে তার অপরাধবোধ পুরো হিন্দু সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। কে তাকে মারলো, সে খোঁজ না করেই। হরিণ মেরে সলমন খানের শাস্তি হলে তার অপরাধবোধও হিন্দু সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে মাথা ঠাণ্ডা আর দৃষ্টি স্বচ্ছ রেখে এগিয়ে চলা জরুরি। ওদের দিন ফুরিয়ে আসছে। সেটা ওরাও জানে। যুদ্ধে জেতার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো, শত্রুবাহিনীর মধ্যে দলত্যাগী তৈরি করা। সৌদির ঘটনাবলী একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। সৌদির অর্থসাহায্য শুকিয়ে গেলে ওয়াহাবিদের নেটওয়ার্ক, বিশেষত এই হুজুররা একটা বিরাট ধাক্কা খাবে। বেশিদিন কিন্তু সেই পরিস্থিতি থাকবে না। প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে এরা স্থানীয়ভাবে রসদ জোগাড় করতে শুরু করবে। তার আগেই এদের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠভূমিটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। দলে দলে দলত্যাগী তৈরি করতে হবে ওইসব সন্ত্রাসীদের মধ্যে। সেটাই একমাত্র উপায়, বাঙালিকে বাঁচানোর। ওপার বাংলাটা তো বাদের খাতায়। যা করার, এপার বাংলাতেই করতে হবে। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, কথাটা অনেকবার শুনেছি। এবার সেটা বাঙালিকে করে দেখাতে হবে, আমাদের অন্তিম আশ্রয়স্থল খণ্ডিত অবশিষ্ট এপার বাংলায়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

এফ আর ডি আই ও নীরব মোদী
অপপ্রচারের রাজনীতিতে বিপন্ন অর্থনীতি

অম্লান কুসুম ঘোষ

ঘনঘোর বর্ষায় অনেক সময় আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন হয় যে আকাশে সূর্য আছে কিনা বোঝা যায় না, দিনকে রাত বলে ভ্রম হয়। শীতপ্রধান দেশে প্রভাতে অনেক সময় কুয়াশায় সূর্যালোক আচ্ছন্ন হয়। তখনও দিনকে রাত ও সূর্যালোকিত আকাশকে সূর্যহীন বলে মনে হয়। শুধুমাত্র প্রকৃতিতে নয় বাস্তব জীবনেও এরকম উদাহরণ দেখা যায়। বিশেষ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে, সেখানে প্রচারমাধ্যমের ঢক্কানিনাদে অনেক সময় মিথ্যাকেই সত্য বলে মনে হয়। গোয়েবলসীয় এবং স্টালিনীয় প্রচার-দর্শন অনুযায়ী কোনও মিথ্যাকে যদি বারংবার সত্য বলে প্রচার করা হয় তাহলে তাকেই সবাই সত্য বলে মনে করে। বর্তমানে ভারতের জাতীয় আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

গোটা দেশজুড়ে এখন এক প্রবল আতঙ্কের পরিবেশ। প্রথমে 'এফ আর ডি আই' বিল পাশের পর এবং পরে নীরব মোদী দেশত্যাগের পর থেকে প্রচারমাধ্যমের ঢক্কানিনাদে সাধারণ দেশবাসীর ধারণা হয়েছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। সেই কারণে ব্যাঙ্কগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, যে-কোনও দিন ব্যাঙ্কগুলি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। দেউলিয়া হবার পর নতুন 'এফ আর ডি আই' বিলের ফলে সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে আর টাকা ফেরত পাবে না। তাই ব্যাঙ্কে টাকা রাখা আর নিরাপদ নয়। আর এই যাবতীয় দুর্নীতির জন্য দায়ী হলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধান মোদী, কারণ লোকসভা ভোটের আগে মোদী তার প্রচারের জন্য শিল্পপতিদের থেকে টাকা নিয়েছেন। তাই এখন শিল্পপতিদের ঋণ দেওয়ার নামে টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন, শিল্পপতিরা ঋণ নেওয়ার পরে আর টাকা শোধ দেবে না। ফলে ব্যাঙ্কগুলি দেউলিয়া হবে আর তখন যাতে সাধারণ আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার কোনও দায় ব্যাঙ্কগুলির না থাকে তার জন্যই তাড়াহুড়ো করে 'এফ আর ডি আই' বিল পাশ করানো।

কিন্তু বাস্তবে সত্যিই কি তাই ঘটেছে? সেকথা বুঝতে গেলে প্রথমে 'এফ আর ডি আই' বিল সম্বন্ধে এবং নীরব মোদী ও তার মতো ঋণখেলাপীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশদে জানতে হবে। প্রথমত, 'এফ আর ডি আই' বিল অনুযায়ী এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফেরৎ পাওয়া যাবে বিমার মাধ্যমে সরাসরি টাকা হিসেবে আর তদুর্ধ অর্থ ব্যাঙ্কের শেয়ার বা ডিভিডেন্ড হিসেবে পাওয়া যাবে। এতদিন পর্যন্ত যে নিয়ম ছিল তদনুযায়ী এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফেরৎ পাওয়া যেত বিমার মাধ্যমে সরাসরি টাকা হিসেবে আর তদুর্ধ অর্থ ফেরৎ পাওয়ার ব্যপ্যারে কোনও কিছু বলা ছিল না। অর্থাৎ তদুর্ধ অর্থ ফেরৎ পাওয়া যেত না। বর্তমান সংশোধনী অনুযায়ী এক লক্ষের বেশি টাকার জন্য ব্যাঙ্কের শেয়ার পাওয়া যাবে। বিরোধীরা এবং সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন তুলছে যে, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যাঙ্কের শেয়ার থেকে আমানতকারী কীভাবে তাঁর ক্ষতি পূরণ করবেন? এতদিন তো ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। একথা সত্য যে, দেউলিয়া ব্যাঙ্কের শেয়ার থেকে ক্ষতিপূরণ করা কঠিন কিন্তু নাই-মামার চেয়ে তো কানা-মামা ভালো। কোনও ব্যবস্থা না থাকার চেয়ে কিছু ব্যবস্থা থাকা ভালো। বিভ্রান্তি আরও ছড়াচ্ছে বেল-ইন এবং বেল-আউট নিয়ে।

বেল-ইন ব্যবস্থার অর্থ হলো কোনও ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে সরকার বাইরে থেকে অর্থ দিয়ে সেই ব্যাঙ্ককে সাহায্য করবে। আর এফ আর ডি আই বিলে আনা বেল-আউট পদ্ধতি অনুযায়ী কোনও ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে সেই ব্যাঙ্কের স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে ব্যাঙ্কগুলিকে সেই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বেল আউটের তুলনায় বেল ইন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ বেল ইন পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নিজেদের কাজের দায় নিজেদেরই নিতে হবে। সে কারণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিজের কাজের ব্যাপারে অনেক বেশি দায়বদ্ধ থাকবে। বেল আউট পদ্ধতিতে দায় সরকারের থাকলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাজ সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারেন। কিন্তু এই বেল ইন ও বেল আউট নিয়েও প্রচুর অপপ্রচার হচ্ছে। পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া দুজায়গাতেই প্রচার চলছে যে বেল আউটের ফলে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে আমানতকারীদের আমানত থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে। এই কথায় সাধারণ আমানতকারীরা অত্যন্ত ভীত হয়েছেন এবং এই ভীতি দ্রুত সঞ্চরণশীল হয়ে গোটা দেশে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, কথাটি কিন্তু ভুল। কারণ আমানতকারীদের জমানো টাকা ব্যাঙ্কের স্থায়ী সম্পদ নয়, বরং তা ব্যাঙ্কের দায়। তাই বেল আউটের ফলে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে আমানতকারীদের আমানত থেকে টাকা কেটে নিতে পারবে না। অর্থাৎ 'এফ আর ডি আই' বিল পেশের ফলে ব্যাঙ্ককর্তাদের রাতের ঘুম উড়লেও আমানতকারীদের কোনও অসুবিধা হবে না বরং ব্যাঙ্ককর্তাদের সচেতনতা এবং ব্যাঙ্ককর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের সঞ্চিত আমানতের ভবিষ্যৎ আরও সুরক্ষিত হলো। অর্থাৎ 'এফ আর ডি আই' বিল পেশের ফলে আমানতকারীদের অসুবিধা তো হয়ইনি, বরং সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দল এবং প্রচারমাধ্যমের সমবেত ঐক্যতান আমানতকারীদের ভীত করছে।

দ্বিতীয়ত, নীরব মোদী বা বিজয় মাল্য

যখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তখন কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় ছিল না। পূর্ববর্তী সরকারের আমলেই তারা অবৈধভাবে লোন পেয়েছেন, সেই আমলেই তাদের লোন অনাদায়ী ঘোষিত হয়েছেন। কিন্তু সেই আমলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তখন তারা দেশে থেকে নির্বিবাদে নিজেদের ব্যবসা করেছে, ক্রিকেটদল কিনেছেন। তাদের কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের বিলাসবহুল জীবন যাপন করছিলেন। বিগত সরকার তাদের সম্পত্তি ক্রোক করেনি, এমন কোনও অবস্থা সৃষ্টি করেনি যাতে তারা বিপন্ন বোধ করেন এবং দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করতে বাধ্য হন। তখন সংবাদমাধ্যমও এই ব্যাপার নিয়ে কোনওরূপ হইচই করেনি। বর্তমান সরকারের আমলে এই সব ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে যখন পদক্ষেপ করা শুরু হলো তখনই সেইসব ঋণখেলাপিদের আতঙ্কের দিন শুরু হলো এবং তারা দেশ থেকে পালানো শুরু করলো। একথা সত্য যে মোদী সরকার তাদের দেশত্যাগ করা ঠেকাতে পারেনি সতর্ক এবং দক্ষ সরকার হিসেবে যা তাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু মোদী সরকারই যে এই দুর্নীতির জন্য দায়ী তা তো নয়। মোদী সরকার এই দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলে তারা এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনওরূপ তদন্ত চালাত না। দুর্নীতিগ্রস্তদেরও দেশ ছেড়ে পালাতে হতো না আর সংবাদমাধ্যমও বিষয়টি সম্বন্ধে নিশ্চুপ থাকতো। মোদী সরকার দুর্নীতিতে জড়িত নয় বলেই তারা এ ব্যাপারে তদন্ত করার সাহস দেখিয়েছে। আর দুর্নীতিতে যারা যুক্ত ছিল সেই সরকার তদন্তের ব্যাপারে নীরব থাকলেও সেই সরকারের প্রধান ও অন্যান্য শরিক শাসক দলগুলি এখন মোদী সরকারের নিন্দার ব্যাপারে মুক্তকচ্ছ ও উর্ধ্ববাহু হয়েছে। তাদের সরকারে থাকাকালীন নীরবতা এবং বর্তমানে তদন্ত চলাকালীন সম্মিলিত বিরোধিতার উচ্চগ্রাম সকলের মনেই এই সন্দেহের জন্ম দেয় যে, তাদের এই বিরোধিতা কতটা দেশহিতের জন্য আর কতটা ব্যক্তিস্বার্থ বিপন্ন হওয়ার ভীতি থেকে সঞ্জাত। কে জানে কখন কেঁচো খুঁড়তে কেউটের মতো ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া তদন্তে তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের নাম বেরিয়ে পড়ে।

অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা সত্যি যে, এই কেউটেরূপী বিরোধী রাজনীতিকরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে (অর্থাৎ সন্দেহের তির নিজেদের দিক থেকে মোদীর দিকে ঘুরিয়ে দিতে) এখনও পর্যন্ত অনেকটাই সফল। তাদের এই ঘৃণিত অপপ্রচার জনমানসে ইতিমধ্যেই অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকেই এখন পূর্ববর্তী সরকারের বদলে তদন্তকারী মোদী সরকারকে দোষী বলে মনে করছে। দশ-চক্রে ভগবান ভূত হয়েছে, কিন্তু বিপদের এতেই ইতি নয়।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য বিরোধীরা এই ঘৃণিত অপপ্রচার চালালেও এই অপপ্রচার এবং তজ্জনিত কারণে আমানতকারীদের ভীত হওয়ার কুফল কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতির জগতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং জাতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে ভীষণভাবে। আমানতকারীরা ভীত হলে এবং সেই ভীতিজনিত কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা হারালে তারা আর নিজেদের অর্থের সুরক্ষিত ঠিকানা হিসেবে ব্যাঙ্কের ওপর বিশ্বাস রাখবে না। ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য নিজেদের অর্থ ব্যাঙ্কের বদলে নিজেদের বাড়িতে বা অন্য কোনও জায়গায় রাখবে। জাতীয় অর্থনীতিতে জমা হিসেবে কিছু থাকবে না। ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর ফল হবে ভয়াবহ। কারণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রদেহের মধ্যে অর্থের সামগ্রিক সঞ্চালন ঘটায়, নিজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ সম্পূর্ণ করার পর কোনও ব্যক্তির হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকতে পারে আবার কোনও ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত অর্থের দরকার হতে পারে উপরোক্ত দুটি কারণে। এরকম ক্ষেত্রে এই দুই ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রদেহের দুই পৃথক জীবকোষ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যায় এবং এদের পরস্পর বিপরীতমুখী প্রয়োজনকে পরস্পরের প্রয়োজন নিবারক হতে সাহায্য করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা একদিকে উদ্বৃত্ত অর্থের অধিকারী ব্যক্তিকে দেয় সঞ্চয়ের সুযোগ ভবিষ্যতের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। আবার অধিক অর্থ-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে তার বর্তমানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করে ভবিষ্যতে নিজের অর্জিত অর্থ থেকে তা পরিশোধ করার চুক্তির বিনিময়ে। এভাবেই উদ্বৃত্ত অর্থের জোগান ও প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অর্থনীতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যদি বিপর্যয় দেখা যায়, তাহলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। যেমন দেখা গিয়েছিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায়।

দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অস্তিত্বই যদি বিপন্ন হয় তাহলে রাষ্ট্রদেহের প্রত্যেক মানুষই হয়ে পড়বে এককোষী প্রাণীর মতো পৃথক। সেখানে একের সঞ্চয় অপরের বিনিয়োগে পরিণত হবে না। প্রত্যেকে তার সীমিত উদ্বৃত্তের মধ্যেই নিজের প্রয়োজনীয় ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। ফলে বিনিয়োগের অনেক উন্নত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তের অভাবে। আবার অধিক উদ্বৃত্তের অধিকারী সঞ্চয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় বিনিয়োগের উপযুক্ত ও নিজস্ব পরিকল্পনার অভাবে। অর্থনীতির এহেন বিপর্যয়ের সাক্ষী ছিল তালিবানশাসিত আফগানিস্তান (ইসলামে সুদের কারবার নিষিদ্ধ বলে সেই সময় আফগানিস্তানে ব্যাঙ্ক ছিল বেআইনি)।

বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, দুঃসংবাদ বাতাসেরও আগে ছোটে। বাস্তব ঘটনা হলো দুঃসংবাদের মিথ্যা রটনাও একই রকম দ্রুতগামী। দেশের ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা সংক্রান্ত এহেন দুঃসংবাদ ইতিমধ্যেই জনমানসে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। দুঃসংবাদটি আরও আতঙ্ক বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতির স্থায়ী কোনও ক্ষতিসাধন করার আগেই মোদী সরকারের উচিত অবিলম্বে নীরব মোদী সহ সমস্ত ঋণখেলাপী ভদ্রবেশী চোরেদের ইন্টারপোল-এর সাহায্যে এবং বন্দী-প্রত্যার্পণ চুক্তির মাধ্যমে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অর্থসহ দেশে ফিরিয়ে আনা এবং সমস্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের পর উপযুক্ত শাস্তির জন্য ন্যায়ালয়ের হাতে অর্পণ করা। একমাত্র তাহলেই এই সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে দেশ এবং মোদী সরকার উভয়েই রক্ষা পাবে।■

আগরতলা বইমেলায় স্বস্তিকা

আগরতলা থেকে তাপস দত্ত॥ ৩৬ তম আগরতলা বইমেলায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা'র স্টল ছিল সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছে দৃষ্টি আকর্ষক। ২ এপ্রিল বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরের একটানা অগণতান্ত্রিক, এক মতাবলম্বী রক্তিম শাসনের অধ্যায় ৩ মার্চ শেষ হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারির জনাদেশের ফলে। খুন, জখম, ভীতি, নির্যাতন এসব নিয়ে কাস্তে হাতুড়ি তারার দর্প, দম্ভ ভূপতিত হয়েছে পদ্মের ঝড়ে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সাধারণ মানুষ। আগরতলা বইমেলাও ফেলেছে মুক্তির নিঃশ্বাস। যে বইমেলা ব্যবহৃত হতো চীন, ভিয়েতনাম কিংবা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশের প্রশংসায় ও ভারতের নিন্দায়।

বইমেলার প্রাঙ্গণে আলোচনা সভায় দীর্ঘ ৩৫টি বছর প্রশংসিত হয়েছেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, গুয়েভারা, কাস্ত্রো, শাভেজ। উপেক্ষিত হয়েছেন ভারতীয় মনীষীরা। ভারতীয়ত্ব, দেশাত্মবোধ তীব্র নিন্দিত হয়েছে প্রধানত গত কুড়ি বছর মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের শাসনে। এজন্য অনেকে জনসাধারণের বৃহদংশ দ্বারা অপসারিত এই তথাকথিত মিস্টার ক্লিন ইমেজ নেতাকে 'সরকার বাহাদুর' আখ্যা দিয়েছিলেন।

এবার শিশু উদ্যানে ফিরে আসা বই মেলায় মূল বিষয় ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি। বইমেলা উপলক্ষ্যে উদ্যানের সম্মুখস্থ রাস্তায় চিত্রকলায় স্নাতকরা এঁকেছিল আলপনা। আগরতলা বইমেলার ইতিহাসে এবারই প্রথম দেখা গেল ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায়, বীর সাভারকার, গুরুজি গোলওয়ালকর সম্বন্ধে বই। দেদার বিক্রি হয়েছে।

শিবপ্রসাদ রায়, অশোক দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, দেবজ্যোতি রায়, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রমুখের লেখা বইও কিনেছে বইপ্রেমীরা। রাজ্যে গৈরিক যুগ শুরুর ঠিক একমাসের মাথায় এই বইমেলা ছিল ঔদার্য্যমণ্ডিত। ভারতবিদ্বেষী যেসব ভারতীয় বলত চীনের চেয়ারম্যান তাদের চেয়ারম্যান, তারাও স্টল খুলেছে আগরতলা বইমেলায়। এতকাল ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে বইমেলা চিন্তার একটি নির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ। বইমেলায় এবার পাঠক-পাঠিকারা পেয়েছে মুক্তচিন্তার আনন্দ। দেশভাগের মর্মন্তুদ ইতিহাস লুকিয়ে রেখেছিল যারা, অরুণাচলপ্রদেশের এক বড় অংশ খেয়েছে যারা, পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব-পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল যারা, ডোকলামে চীনের ও শ্রীনগরে পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখেও জড়বৎ নির্বাক থাকে যারা, বাড়ির কাছে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা আক্রান্ত, নিহত হলে মূক বধির হয়ে থাকে যারা, বিলাসী হয়েও সর্বহারা সেজে থাকে যারা, তাদের প্রকৃত চেহারাটা ত্রিপুরার মানুষের সামনে তুলে ধরেছে এবারের আগরতলা বইমেলা। প্যালেস্তাইন, চীন, পাকিস্তান এবং সদ্য ত্রিপুরার ক্ষমতাহারা দলের হৃদয় ভারতে থেকেও খেয়ে পরেও মন পড়ে থাকে অন্য দেশে, তা বুঝতে পারছে ত্রিপুরার মানুষ।

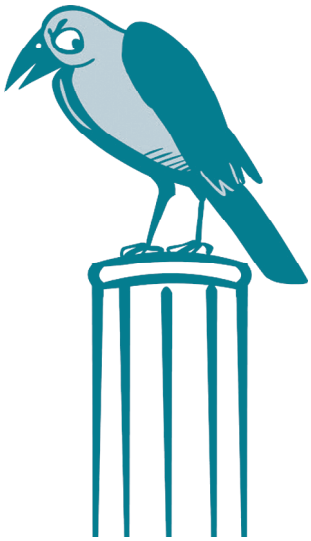

ব্যান্ড বাজা পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢোলে কাঠি পড়ে গেছে। এখন চারিদিকে সাজো সাজো রব, কী করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রহসনকে জম্পেশ করে জমানো যায়। সংস্কৃত আপ্তবাক্যে আছে চক্রবৎ পরিবর্তন্তে জগৎ। কিন্তু সেকথাটি আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসে কেমন যেন ব্যর্থ। কেননা আমাদের মহান গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের পরিবর্তে একটি শাশ্বত সত্যই মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই পুলিশপুষ্ট পার্টি গুণ্ডার নগ্ন দাপাদাপিতে পুলিশতাড়িত বিরোধী পক্ষের গণতন্ত্র ধ্বংসের অসহায় করুণ আর্তনাদ। এবং সরকারপক্ষের পদিপিসির নির্লজ্জ সতীপনা।

তবে তফাৎ একটাই। তখনকার রেডগার্ডদের মহারাজার হুঙ্কার, সব বকওয়াস হ্যায়; আর এখনকার গ্রিনগার্ডদের মক্ষীরানি, ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলির মতো বলছেন, সব ঝুট হ্যায়, কিস্যু হয়নি। কেননা গদিতে বসলেই সকলেই হন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র; দুর্যোধন, দুঃশাসন সব ধোয়া তুলসি পাতা। আমাদের পঞ্চায়েত ভোটের আসল রহস্য হলো, পুলিশ যার, গুণ্ডা তার, আইনও তার; সুতরাং পঞ্চায়েত তার নয়তো কার! এসব আমাদের মহান বঙ্গ মার্কসবাদীদের মুক্তাঞ্চল গঠনের শিক্ষা। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

সরকারের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যবাহী ট্র্যাডিশনের কোনও পরিবর্তন নেই। কেননা এই পঞ্চায়েতই হলো আমাদের বিশ্বের বৃহত্তর গণতন্ত্রের ভিত্তি। পুলিশের প্রশ্রয়ে ও পার্টির আশ্রয়ে এই পঞ্চায়েত যত গুণ্ডা-বদমায়েস, চোর-ছ্যাঁচোড়, খুনী-ডাকাতদের রাজনীতিতে baptism by fire হয়। পাড়ার ইস্কুলে ফেল মারা মস্তান কেষ্টা গোষ্টরা যখন অক্সিজেনের অভাবে মেজাজ হারায় তখনই প্রাণে আসে দেশ সেবায় মহতী প্রেরণা। আর একবার ঝাণ্ডার নিচে পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালে পার্টির সম্পদ হতে পারলে মন্ত্রী-সান্ত্রী হতে কতক্ষণ। তবে লাইনটা ঠিক রাখতে হবে, মিলিটারি কায়দায়। কেননা মিলিটারি প্যারেডেই আছে, লেফট, রাইট— লেফট রাইট। রাজনীতির মিছিলেও তেমনি লেফট রাইট, লেফট রাইট সে বুদ্ধিজীবী সঙ্ঘ থেকে বাহুবলী সঙ্ঘ একই ধারায় পার্টিজীবী হতে বাধ্য। ওয়া পার্টিজি গুরুজি কি ভরসা।

এক সময়ে যখন বাংলায় বামপন্থী স্বর্ণযুগ চলছিল তখন পার্টিবাজ ধেড়ে ইঁদুর থেকে নেংটি ইঁদুর হঠাৎ পুলিশ মুনির মন্ত্রপুত বারি সিঞ্চনে যেন কেঁদো বাঘ হয়ে উঠেছিল, এবং তেনাদের কথাই নাকি ছিল শেষ কথা। মহাকরণে মূর্খের মরণ পেটো পেঁচো, ইউনিয়ন বাজি করে, আজ মুখ্যমন্ত্রীর মাথার টিকি ধরে টান দিচ্ছেন, কাল সেক্রেটারিকে চড় মারছেন, পরশু সব অচল করে দিচ্ছেন। সেই মহামহিম গুণ্ডার পাণ্ডারা আজ কোথায় গিয়ে হাফু গাইছেন। এরাই একদিন মহান মাও-এর কথায় গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও মন্ত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিপুত্র হয়ে এক এক অহিরাবণ মহিরাবণ রূপে সকলের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। কেননা জোর যার মুলুক তার।

আসলে পঞ্চায়েত নিয়ে আমাদের এই মাথাব্যথার কারণ, পঞ্চায়েত আমাদের ভিত্তি, মসনদ আমাদের ভবিষ্যৎ। নগর ও গ্রাম পঞ্চায়েত হাতে রাখতে পারলে মসনদ দখল তো নেহাৎ নস্যি। সেই জন্যেই বোধ হয়, লাল জমানার লিলিপুট ডিক্টেটর বিশ্বেসমশাই, নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে সহাস্যে সংবাদসেবীদের বলেছিলেন, এখন জনপ্রিয়তার যে জোয়ার দেখা যাচ্ছে, তাতে বোধহয় গণতন্ত্র রক্ষায় শেষ পর্যন্ত লাল পার্টিকেই গোলাপি জামা পরিয়ে বিরোধী পক্ষের প্রার্থী সরবরাহ করতে হবে। তাই শুনে সাংবাদিক মহলে সে কী হাসির ঝিলিক। আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন বীরভূমিতে বিয়াল্লিশের মধ্যে একচল্লিশটি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিকার করা যায়, তখন চারিদিকে সবুজ আবিরের ছড়াছড়ি। গোপিনীরা পার্টির রাসলীলার মোচ্ছবে মত্ত।

এই জয় যদি কাঠপুতলি পুলিশের নিরপেক্ষতায় ও গ্রিন পার্টির জায়গিদার কৃষ্ণকান্তের মহিমায় হয়ে থাকে, তাহলে সেদিনও লাল আবির উড়তো লোকাল সম্রাটদের প্রতাপে। সেদিনের সেই আরামবাগ, হলদিয়া, গড়বেতা, বর্ধমান ও শাসনের মুকুটহীন সম্রাটদের সে কী দাপট। তাঁদের অনুমতি ব্যতীত যদি কেউ পঞ্চায়েতে প্রার্থী হতে চাইতেন, তাদের বৌ-দের জন্য থান কাপড়ের উপঢৌকন বাঁধা। আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই, রূপান্তরবাদী পুলিশের সামনেই তাকে নিয়ে চলতো দ্রৌপদীবিলাস।

সেদিন যে সতীসাবিত্রীর দল লাল পার্টির এহেন দ্রৌপদীবিলাস ও থান কাপড় কালচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য রাস্তার রাস্তায় দশাননি হয়ে গলা ফুলিয়েছিলেন, আজ দেখ গদিয়ান হয়ে তাহাদের বিরাট স্বরূপ। তেনাদের মুখে সেদিন কত গালভরা বুলি— গণতন্ত্র রক্ষায় সোচ্চার হোন, নিজের ভোট নিজে দিন, ভোটলুঠের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, পুলিশি মদতে শাসক সন্ত্রাসকে সমুচিত জবাব দিন। এসব মনমোহিনী কথায় মরিয়া হয়ে জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে যখন স্বৈরাচারের অত্যুচ্চ দুর্গ তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়ল, তখন সংগ্রামী সকলে ভাবল ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়। কিন্তু মোহভঙ্গ হতে দেরি হলো না, যাকে তারা জ্যোতির্ময় ভেবেছিল, আসলে সেটা হলো ব্ল্যাকহোলের শেষ অরুণিমা। এক ব্ল্যাক হোল কমেডির পর আবার এক ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডির শুরু। কেবল রঙ বদলের পালা, রেড থেকে গ্রিন।

এই আলোর খেলা বোঝা গেল অচিরেই। কারণ যে সরকারি গুণ্ডা-সন্ত্রাস, শিক্ষায় অরাজকতা, প্রোমোটারি ও সিন্ডিকেট রাজের

প্রতিপত্তি, চিচিং ফাঁকি চুরির অবসানে, গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, সুস্থ রাজনীতি, স্বাধীন সমাজ নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা, মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিতে সরকারের পরিবর্তনে সকলে আশান্বিত হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা কোথায় বা কী, ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে গেল ফট করে। সরকার বদলে, পরিবর্তন হলো শুধু বোতলে, কেননা নব অবতারে গ্রিন বোতলে সেই পুরাতন লাল মদ। জনগণের নাম করে জনগণের সঙ্গে সেই বেহায়া বেইমানি চলছে, চলবে।

সেই একইভাবে নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারে, বঙ্গ বিভীষণের বকলস পরা বেহায়া মেফিস্টদের ঢপকেত্তনে মাতিয়ে রেখে সতীপনার আড়ালে পুলিশি মদতে গুণ্ডারাজের দাপটে, চুরি জোচ্চুরির চিচিং ফাঁকের অবাধ রাজত্ব। লুঠমারের সেই নব নব অবতারের উদ্ভব পঞ্চায়েত থেকে। সেই জন্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্যে এত মাথা ব্যথা। জমানা বদলের বছর দুই ঘুরতে না ঘুরতেই, নীলবর্ণ শৃগালের আসল চেহারাটা ধরা পড়ে গেল। দুহাজার তেরো সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যখন সরকার চাইল, নির্বাচন হবে সরকারের মতে এবং রাজ্য নির্বাচনে কমিশন চলবে সরকারের নির্দেশিত পথে।

কিন্তু তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার আইএএস মীরা পাণ্ডে তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁর অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষীবাহিনী দাবি করলেন। রাজ্য সরকার রাজি না হওয়ায়, বিষয়টি, হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট গড়ালো। কমিশনারের দাবি অনুযায়ী রক্ষীবাহিনী পাওয়া বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হলো না। কেননা সরকারের দলদাস রাজ্য পুলিশের অধীনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজ করাটা শেষ পর্যন্ত একটা নিষ্ক্রিয় প্রহসনে দাঁড়ালো।

কমিশনার মীরা পাণ্ডের চাকরি শেষ সীমায় থাকার ফলে, তাঁর হারাবার কিছু ছিল না বলেই তিনি সমানে সমানে সরকারি দুরভিসন্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে নির্বাচন কমিশনারকে রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করতে হবে, সেই চাকরিজীবীর পক্ষে সরকারি মন্ত্রী মহলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য। সেই জন্যেই পাণ্ডের পরবর্তী কমিশনার যখন ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ চালাবার চেষ্টা করলেন, তখন তাঁর উদ্যোগ বানচাল করতে তিনজন কূটমন্ত্রী গিয়ে তাঁর কাছে দরবারের নাম করে এমন হুমকি, ধমকি দিলেন যে কমিশনার সাহেব, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে ইস্তফা দিয়ে বাঁচলেন। আমাদের বর্তমান কমিশনার সাহেবের অবস্থাও তথৈবচ। স্বাধীনভাবে প্রার্থীপদ একদিন বাড়াতে গিয়ে, নাকানি-চোবানি খেয়ে তিনি অস্থির; অবশেষে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গিলে ফেলে তবে রক্ষে।

আসলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বা কমিশনারকে সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন থেকে মুক্ত করতে না পারলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা যে অসম্ভব সেকথা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। যে চাকরিজীবী আইএএস বা বিসিএস সরকারের অধীনে কাজ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহাকরণে বিপ্লব করতে আসেননি। চাকরির শর্ত অনুযায়ী তিনি উপর মহলের কথা শুনে চলতে বাধ্য। সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশের বিরুদ্ধে যেতে গেলে, যে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রয়োজন, তা আমাদের প্রশাসনিক সিস্টেমে নেই। সংবিধান অনুযায়ী সেই রক্ষাকবচের সিস্টেম তৈরি করতে না পারলে, হয় চাকরি ছেড়ে পথে বসতে হবে, না হলে ধূর্ত ধান্দাবাজ নেতৃত্বের কথা মানতে হবে। দেশের বর্তমান ব্যবস্থায় এছাড়া কোনও উপায় নেই।

সেই জন্যেই দীর্ঘ তিন দশকের বাম জমানায়, নির্বাচনে হতো, নির্বাচন কমিশন তথা কমিশনারের সঙ্গে শেয়ানায় শেয়ানায় ধূর্ত ধড়িবাজদের কোলাকুলি। ফলে কমিশনারের পক্ষে, নির্লজ্জ গুণ্ডামির দিকে চোখ বুজে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলতে কিছু মাত্র বাধে না। ত্রাস, সন্ত্রাস ও গুণ্ডামির সচিত্র পরিচয় দিলেও এনাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বাংলাদেশের মিলিটারি প্রেসিডেন্ট এরশাদ যেমন একদা বলেছিলেন, আপনি যা দেখেছেন, ওরকম একটু-আধটু হয়ে থাকতেই পারে, কিন্তু অন্য সব জায়গায় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। সেই সুরেই আমাদের বাংলার নির্বাচন কমিশনাররা সরকারের মুখে ঝাল খেয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে ছাড়পত্র দিয়ে চাকরিতে প্রোমোশন পেয়ে রাজা উজীর মারেন। তাঁদের বুদ্ধি একমাত্র খোলে অবসর গ্রহণের পর; তখন তাঁরা এক একজন ত্রিকালজ্ঞ পীরের মতোই ফতোয়া ঝাড়েন।

স্বাধীনতার পর, আমাদের নিরক্ষরের দেশে নির্বাচন একরকম চলছিল কিন্তু তাঁর আমূল পরিবর্তন দেখা দিল সাতষট্টি সালের কাছাকাছি, যখন কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজ্যে কমরেড জ্যোতি বসুর মদতে রাজনীতিতে গুণ্ডাদের দাপট প্রবল হয়ে উঠল। রাজনীতির আনাচে কানাচে প্রসাদভিক্ষু গুণ্ডারা অবশ্য সব সময়ই ছিল, কিন্তু নেপথ্যে। প্রমোদপল্লীর রমণীদের মতো তারা কখনোই প্রকাশ্যে আস্ফালনের সাহস করত না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম মহাত্মা গান্ধীর বিপরীতে প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন যে, Means নয় ends টাই বড়ো। সরকারের দরকার, কাজ হাসিল করা সুতরাং কে গুণ্ডা, বদমায়েশ, চোর-জোচ্চোর তা দেখার প্রয়োজন নেই, কাজের লোক হলেই হলো। আর কমিউনিস্ট ভেকধারীদের কাছে লুম্পেন প্রোলেটারিয়েটরা যে পার্টির মহাসম্পদ তা তো আমাদের রাজ্যে তিন দশকের লুঠমার রাজত্বেই প্রমাণ।

আমাদের সংবিধান সরকার ও প্রশাসনের বিচ্যুতি রোধকল্পে Checks and balances-এর জন্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থাগুলিকে সরকার নিরপেক্ষ রাখার প্রয়াস করা হয়েছিল— যেমন নির্বাচন কমিশন, বিচার ব্যবস্থা বা রাজনীতি জগতের বাইরে থেকে আসা কৃতী ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীদের নিয়ে গঠিত সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। কিন্তু বেআইনি জরুরি অবস্থার সুযোগে মহীয়সী ইন্দিরা সেগুলির মূলে কুঠারাঘাত করে সেগুলিকে সরকারি তাঁবেদার সংস্থাতে পরিণত করেন। নির্বাচন কমিশন তারই অন্যতম বলি।

অথচ রাষ্ট্রপতির অধীনে সরকারি তাঁবেদারি বহির্ভূত কমিশনের নিরপেক্ষ একটি ক্যাডার অনায়াসেই গঠন করা যেতে পারে। রাজ্যে সেটি থাকবে সরাসরি রাজ্যপালের অধীনে। কিন্তু সেদিকে কারোর লক্ষ্য নেই বলেই নিরপেক্ষতার ঘোমটার আড়ালে সরকারি হস্তক্ষেপের খেমটা নাচ যেমন চলছিল তেমনি চলছে। ■

চিঠিপত্র

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পর্ব

উত্তরবঙ্গে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে, তাতে এই সরকারের মিথ্যা উন্নয়নের কারসাজি ধরা পড়ে গেছে। সবচেয়ে নজরকাড়া বিষয়টি হলো, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের নিষ্ক্রিয়তা। সরাসরি এবার বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের মধ্যে টক্কর হচ্ছে, যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। অনেক জায়গায় তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষ করে বিজেপি প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন জমা করেছে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে রামনবমীর বড়ো বড়ো শোভাযাত্রায় হাজার হাজার ধর্মপরায়ণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং শাসক দলের তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে এবার বিজেপি জোরদার লড়াই করবে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। মালদা জেলায় জেলা পরিষদের ৩৮টি সিটেই এ বছর তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই হবে এবং ৯-১০টি আসন বিজেপি পেলেও পেতে পারে। মালদা জেলার হবিবপুর, ইংলিশবাজার, পুরাতন মালদা-সহ কালিয়াচকের বহু পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে যেভাবে মানুষ বিজেপির দিকে ঝুঁকছে তাতে এই জেলায় এবার আশাতীত ফলাফল হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

—তরুণ কুমার পণ্ডিত,
মালদহ।

রামনবমীতে শোভাযাত্রা

গত ২৮ মার্চ, ২০১৮-য় আমাদের মাননীয় মুখমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিল্লিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতাদের ফেডারেল ফ্রন্টের অলীক স্বপ্ন দেখিয়ে কলকাতায় এসে হুঙ্কার দিলেন, 'যারা রামনামের বদনাম করে এ কোন ধর্ম, আমরা এসব বরদাস্ত করবো না।' রানিগঞ্জের রামনবমী মিছিলকে কেন্দ্র করে বেশকিছু এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা না করে বিমান থেকে নেমেই হুঙ্কার ছাড়লেন। এই হুঙ্কারের পিছনে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাদের খুশি রাখার আগাম ইঙ্গিত দিলেন এইটুকু বোঝার ক্ষমতা কি সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের নেই? এপার বাংলার সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা না হয় বোবা কালা, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা কি কোমায়? মমতা ব্যানার্জির টিএমসি আদ্যোপান্ত ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে দাবি করে থাকে, তাহলে যারা রামনবমী পালন করতে চায় তাদের শোভাযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় কোন যুক্তিতে? এতদিন আমরা মমতা ব্যানার্জির মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য মুসলমান নারীর আদব-কায়দায় নতজানু হয়ে ভোটভিক্ষার ছবি দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। ওটা কি ধর্মনিরপেক্ষতা ভেকধারী কৌশলী আচরণ? না সস্তার রাজনৈতিক চমক? সংবিধানে একটা ভিন্নধর্মের ব্যক্তি মানুষের এইরূপ আচরণের উল্লেখ আছে? আজ হঠাৎ করে অতি হিন্দুয়ানী প্রদর্শনের জন্য দলকে রামনবমী পালনে নির্দেশ দেওয়ার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবারও ভেবে দেখেছেন দলে কতজন রামভক্ত ও হনুমান ভক্ত দলের শৃঙ্খলা মেনে চলেন। ঘোঁট পাকাবার ভক্তের অভাব দলের ভিতর কি কম আছে? কারা রামভক্ত সেজে অপরের রামনবমীর শোভাযাত্রায় বোমাবাজি করে গেল তা নপুংসক মিডিয়া কার নির্দেশমতো চেপে যাচ্ছে? এর সুদূর প্রসারী ফল কী হতে পরে? এসব কি সচেতন মানুষ ভাববে না? মুসলমান মানসে মহরম শোকের দিন। সেই মহরমের শোকের মিছিলে লাঠিখেলা তরোয়াল খেলা কি কখনও নিষিদ্ধ করার সাহস দেখাতে পারেন আমাদের দেশের সেকুলারবুদ্ধি রাজনৈতিক বোদ্ধারা? ধনুকধারী রাম লঙ্কা অভিযানে তাঁর প্রিয়তমাপত্নী সীতার অপহরণকারী রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত এবং সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। মর্যাদাপুরুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। হিন্দু মানসে শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষাত্রশক্তিকে স্মরণীয় রাখার পরম্পরাগত রামের জন্মদিন রামনবমীর প্রতীকী অস্ত্রপ্রদর্শনীতে কারও মনে আঘাত খোঁজা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

তৃণমূলের রামনবমী প্রীতি

এতদিন পর্যন্ত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়ে তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে সব দলকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। হঠাৎ করে কী এমন হলো যে তাঁর নিজ দলেরও রামনবমী পালনের তাগিদ দেখা দিল? এই প্রশ্নটা আজ সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে বিশেষ ভাবে নাড়া দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তো আমরা দেখে আসছি হিন্দু ধর্মের কোনও অনুষ্ঠান অপেক্ষা কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রায় সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি।

কারণটা আর কিছু নয়, শুধুমাত্র ওই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টিকে যেনতেন প্রকারেণ হাতে রাখা। এবং ভোট ব্যাঙ্ককে অটুট রাখা। তিনি ভেবেছিলেন যে এই ৩০ শতাংশ ভোটের সবটাই যদি তাঁর কব্জায় থাকে তাহলে তাঁর জয় কে আটকায়। বাকি সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটটা তো পাবই। কিন্তু গতবারের রামনবমীতে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে শোভাযাত্রা দেখে তৃণমূল নেত্রীর চক্ষু চড়কগাছ। তিনি ভাবতেও পারেননি যে

ইতিমধ্যে হিন্দুরা এতো সম্মিলিত হয়ে গেছে। তাই তিনি পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই সতর্ক হচ্ছেন। পঞ্চায়েত ভোটে জয়ের জন্য। অতএব এখন থেকেই বিজেপি বিরোধী দুর্নীতিপরায়ণ আঞ্চলিক দলগুলিকে এক ছাদের তলায় আনতে না পারলে তাঁর মহা বিপদ। তাই যেমন তেমন করে দলগুলিকে কাছে টেনে নিজের বিপদ কাটাতে চাইছেন। আর কংগ্রেস সিপিএম ও মায়াবতী-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের দুর্বলতা জেনে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ভুলেও শুধুমাত্র বিজেপিকে রুখতে আদাজল খেয়ে আসরে নেমে পড়েছে। তাই সকলেই এখন মমতাকে মধ্যমণি করে তাঁর উপর ভর করে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছে।

রামনবমী প্রীতিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সুপ্রিমো যতই হিন্দু প্রীতি দেখান না কেন, হিন্দু জনগণ এতো বোকা নয় যে তার রামনবমী প্রীতির অন্তরালে রয়েছে মুসলমান তোষণ মাত্র সেটা বুঝতে ভুল করবে। অতএব তার এই রামনবমী পালন শুধুই লোকদেখানো, ভণ্ডামী।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
মুন্সিরহাট, হাওড়া।

জালি পাণ্ডবদের কীর্তি-কলাপ

১৮ মার্চ রবিবার রাজধানী দিল্লিতে কংগ্রেসের ৮৪ তম প্লেনারি সেশনের অন্তিম দিনের ভাষণে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ২০১৯-এর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন--- 'বিজেপি, আর এস এস কৌরবদের মতো ক্ষমতালোভী। অপরদিকে, কংগ্রেস হচ্ছে পাণ্ডবদের মতো, সত্যের স্বার্থেই আমাদের সংগ্রাম।'

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে কোণঠাসা করার চেষ্টা করতেই পারে। তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু অতীত যাদের কলঙ্কময়, দেশের জনগণ কি তাদের অতীতের সেই ঘটনাগুলি বেমালুম ভুলে গিয়ে বর্তমানের কুনাট্য দেখে রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসকে দু' হাত ভরে ভোট দেবে? তাই রাহুল গান্ধীর নিকট সবিনয়ে কয়েকটি কথা জানাতে চাইছি। এর পরেও আপনার দল অর্থাৎ মেকি পাণ্ডবকে কেউ বিশ্বাস করবে তো?

১। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করেছে কে?

উ: কংগ্রেস দল এবং তার সভাপতি জওহরলাল নেহরু।

২। দেশ ভাগের পর ধর্মের ভিত্তিতে উভয় দেশের লোক বিনিময় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও বাবাসাহেব আম্বেদকর। সে প্রস্তাব খারিজ করেছে কে?

উ: জওহরলাল নেহরু।

৩। কাশ্মীর সমস্যা জাতিপুঞ্জে নিয়ে গিয়ে জটিল করে তুলেছে কে?

উ: জওহরলাল নেহরু।

৪। সেনাবাহিনীর জিপ কেনার কেলেঙ্কারি কার আমলে?

উ: জওহরলাল নেহরু।

৫। দেশমাতৃকার সুসন্তান সুভাষ বোসকে দেশে ঢুকতে দেয়নি কে?

উ: জওহরলাল নেহরু।

৬। ১৯৭৫ সালে দেশে কালাকানুন নামক জরুরি অবস্থা জারি করেছিল কে?

উ: ইন্দিরা গান্ধী।

৭। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার পর দেশজুড়ে শিখ নিধন শুরু করেছিল কারা?

উ: কংগ্রেস নেতারা।

৮। ভূপাল গ্যাস কেলেঙ্কারির খলনায়ক ইউনিয়ন কার্বাইডের কর্তা আণ্ডারসন এদেশ থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়?

উ: প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ (লোকে বলে বকলমা প্রধানমন্ত্রী সোনিয়া গান্ধী)-র আমলে।

৯। কয়লা ব্লক বণ্টন কেলেঙ্কারিতে সাহায্য করেছে কে?

উ: কংগ্রেস সরকার।

১০। ন্যাশনাল হেরল্ড পত্রিকা মামলায় অভিযুক্ত এবং সশরীরে আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন নিয়েছেন কে কে?

উ: কংগ্রেসের প্রাক্তন এবং বর্তমান সভাপতি যথাক্রমে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী।

এখন লোকে বলাবলি করছে— কংগ্রেস এবং তার কর্তাদের এসমস্ত গুণের কথা জানার পর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে জালিমাল পাণ্ডবদের বাতিল করে জনগণেশ সঠিক বোতামই টিপে দেবেন।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদা।

মূল্যবোধের অবক্ষয়

একটা সময় ছিল যখন প্রবীণরাও তাঁদের থেকে বয়েসে বড়ো শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। এই দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। এর কারণ আজকের ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই শিক্ষকদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা অনুভব করে না, যার জন্য প্রণত হওয়া যায়। স্বাধীনতার আগে বা তার পরবর্তী কয়েক দশকে স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা চাকরি করতেন ঠিকই, কিন্তু কাজটিকে তারা শুধু চাকরি বা পেশা হিসেবে দেখতেন না। শিক্ষকতা ছিল তাদের জীবনের আদর্শ। ফলে তারা বেতন কম পেলেও মূল্যবোধের পরিসরটি ভেঙে পড়তে দেননি। অবক্ষয় শুরু হলো নব্বই-এর দশক থেকে। না, বিশ্বায়নকে কোনওভাবেই এর জন্য দায়ী করা যাবে না। পৃথিবীর বহু দেশেই শিক্ষকেরা সম্মানিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকদের ভি আই পি-র মর্যাদা দেওয়া হয়। ফ্রান্সের আদালতে শুধু শিক্ষকেরাই চেয়ারে বসার অনুমতি পান। জাপান সরকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সে দেশের শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা যায় না। কোরিয়ায় শিক্ষকেরা মন্ত্রীদের সমান সুযোগ সুবিধে পান। প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষকের এই হাল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে না পারলে রাজ্য এগোবে না। দেশও না।

—**অনুপম চাকলাদার,**
সিউড়ী, বীরভূম।

মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার

সৌমী দাঁ

আজকের বিষয়টি হলো মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার। এই বিষয়টির পরিধি অনেক বড় এবং বিতর্কিত। মেয়েদের যেমন অনেকরূপ, তাদের লড়াইটাও নানা ক্ষেত্রে নানারকম। কোথাও মেয়ে, বোন, মা, কোথাও ডির্ভোসি কোথাও বা বিধবা। কোথাও তার লড়াই স্বামীর ও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে, কোথাও সে ভাই, দাদা ও আত্মীয়দের বঞ্চনার শিকার। বর্তমানে মেয়েরা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হলেও সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে এখনও অনেকেই অন্ধকারে। সমস্যায় পড়লে কীভাবে লড়বে সেই সচেতনতার জন্যই এই বিষয়টির নির্বাচন।

এবারের বিষয়টি হলো বিয়ের আগে ও পরে পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার।

প্রথমেই একটি বিষয় পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই। হিন্দুদের সম্পত্তি অধিকার প্রধানত দুটি বিধি অনুযায়ী— (১) দয়াভাগা, (২) মিতাক্ষরা।

মিতাক্ষরা বিধির মধ্যে তারাই অন্তর্গত যাদের উৎস বা শিকড় প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। এই ক্ষেত্রে ২০০৫-এ হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে।

দয়াভাগা বিধির অন্তর্গত তারা যাদের শিকড় বা উৎস প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে। এই বিধি অনুযায়ী হিন্দু মেয়েদের বিয়ের আগে পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে অধিকারগুলি হলো :

জন্মের পর থেকেই মেয়েরা পৈতৃক বসতভিটেতে থাকতে পারবেন। সাবালিকা ও কর্মরতা অবিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রেও সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ।

আয় ও অবলম্বনহীন মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার বাবাকে নিতে হবে।

অস্বীকার করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। আদালতের দ্বারস্থ হলে পরিস্থিতি বিচার করে মেয়েটির দায়িত্ব আইনত যার ওপরে বর্তায়, আদালত তাকে তুলে দেবেন।

বাবার অবর্তমানে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব ভাই-বোনের এবং মা-এর মধ্যে সমানভাগ হবে উইলের অবর্তমানে।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় হলো, বাবার সম্পত্তি বাবা হয় বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, নয়তো স্বউপার্জিত। সেই সম্পত্তি তিনি উইল করে যাকে ইচ্ছে দিতে পারেন বা বঞ্চিত করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে বঞ্চিত মেয়েটির উইলটি চ্যালেঞ্জ করার আইনি অধিকার আছে। সম্পত্তির আধিকারীদের উইল কার্যকরী করতে প্রোবেট নিতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে বাকি সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের নোটিশ পাঠাতে হবে। নোটিশ গ্রহণের পর আদালতে হাজির হয়ে দরখাস্তের মাধ্যমে বঞ্চিত মেয়ে তার দাবি ও আপত্তি জানাতে পারেন।

একক সন্তান হলে বাবা এবং মায়ের অবর্তমানে স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তির মালিক মেয়েটি হবে (উইলের অর্বতমানে)।

বাবা যদি মৃত্যুর আগে দানপত্র বা পারিবারিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব সম্পত্তি ভাগ করে দেন, সেক্ষেত্রে বাবা যাকে যা দেবেন সেটাই তার প্রাপ্য। আর না দিলে পাবেন না। দানপত্র বা গিফট-এর ক্ষেত্রে তা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয় অর্থাৎ বাবা জীবিত থাকা কালেই।

অঙ্গনা

বিয়ের পর

বিয়ের পরও একটি মেয়ের পৈতৃক স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তিতে সমান অধিকার বজায় থাকে অন্য ভাগীদারদের সঙ্গে। বিয়ের পরও একটি মেয়ে তার মা ও অন্যান্য ভাই ও অবিবাহিতা বোনদের মতো পৈতৃক বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে সমান অংশীদার। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদাররা বিবাহিত মেয়েটিকে লুকিয়ে বা বঞ্চিত করে পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না। আর যদি করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে বঞ্চিত মেয়েটি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে দরখাস্তের মাধ্যমে নিজের অংশ দাবি করতে পারে এবং অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপরে ইনজাংশন বা স্টে অর্ডার চাইতে পারে।

বিবাহিত মেয়েটি চাকুরিরতা হোক বা না হোক, সে বাপের বাড়ির স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির সমান অধিকারী অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মতোই। তবে একইভাবে বাবা যদি উইল করে নিজের ইচ্ছানুসারে সম্পত্তি ভাগ করেন সেক্ষেত্রে যদি তিনি বিবাহিত মেয়েটিকে বঞ্চিত করে যান তাহলে বিবাহিত মেয়েটির উইল চ্যালেঞ্জ করার আইনি অধিকার আছে। সম্পত্তির অধিকারীদের উইল কার্যকরী করতে প্রোবেট নিতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে অন্য উত্তরাধিকারদের নোটিশ পাঠাতে হবে। নোটিশ গ্রহণের পর আদালতে হাজির হয়ে দরখাস্তের মাধ্যমে বঞ্চিত মেয়েটি তার দাবি ও আপত্তি জানাতে পারে।

একমাত্র সন্তান হলে বিয়ের পরও বাবা ও মায়ের অবর্তমানে সেই বিবাহিত মেয়েটিই সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে। এবং মা জীবিত থাকলে মা ও মেয়ে সমান অধিকার পাবে।

বাবা যদি মৃত্যুর আগেই দানপত্র করেন বা পারিবারিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব সম্পত্তি ভাগ করে দেন সেক্ষেত্রে বাবা যাকে যা দেবেন সেটাই তার প্রাপ্য আর না দিলে পাবেন না। দানপত্র বা গিফট-এর ক্ষেত্রে তা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়।

(লেখিকা একজন আইনজীবী)

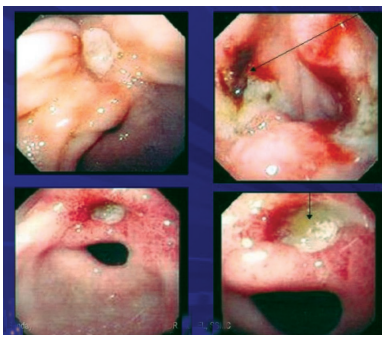

পেপটিক আলসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মে পাকস্থলী বা স্টমাকে গোলমাল, আর উপশমের জন্য অ্যান্টাসিড খাওয়া অনেকে এমনটাই মনে করে থাকেন। কিন্তু অবহেলাতেই পাকস্থলীর গোলমাল এক সময় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই পাকস্থলী গোলমাল নিয়ে আজকের আলোচনা।

পেপটিক আলসার :

পেপটিক আলসারের অর্থ— পাকস্থলীতে ঘা অথবা প্রদাহ। পাকস্থলীর গায়ে বা ক্ষুদ্রান্ত্রের শুরুর অংশে এইরকম ঘা সৃষ্টি হলে চিকিৎসার ভাষায় পেপটিক আলসার বলা হয়।

কারণ :

পেপটিক আলসার কেবলমাত্র একটি কারণেই হয় না। বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন—

• পাকস্থলীতে হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ পেপটিক আলসার হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এই ইনফেকশন হলে স্টমাকের ভিতরের অংশে তীব্র প্রদাহ হয়।

• দীর্ঘদিন ধরে অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ খাওয়া হলে।

• নিয়মিতভাবে অ্যাসপিরিন, ন্যাপরক্সিন, ইবুপ্রোফেনের মতো পেনকিলার ব্যবহার করলে।

• পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্টস নিলে।

• অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান, তামাক জাতীয় দ্রব্যের নেশা থাকলে।

• রেডিয়েশন চিকিৎসা চললে।

উপসর্গ :

সবসময় যে বিশেষ কোনও উপসর্গ বোঝা যায়, এমন নয়। তবে যে লক্ষণগুলি সাধারণত দেখা যায় সেগুলি হলো—

• মধ্যচ্ছদা অথবা পাকস্থলীর উপর দিকে ব্যথা।

• কিছু না খেয়েও পেট ভার।

• বমিভাব বা বমি হওয়া।

• রক্তবমি হতে পারে।

• বারবার খিদে পাওয়া।

• ঝিমুনি ভাব, ক্লান্তি।

• অনেক ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া।

• মলের সঙ্গে রক্ত পড়া বা কালো মল।

এছাড়া বুকে ব্যথা, তলপেটে জ্বালা, ব্যথার জন্য রাতে ঘুম না হওয়া প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়।

জটিলতা :

এই সমস্যা অবহেলা করলে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, পাকস্থলীতে ছিদ্র বা পারফোরেশন, ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই রোগের শুরুতেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

রোগ নির্ণয় :

রোগ নির্ণয় করার জন্য রক্ত, মল পরীক্ষা; আলট্রাসোনোগ্রাফি, এন্ডোস্কপি, বেরিয়াম মিল এক্সরে, বায়োপসি চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে করাতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী নাক্সভম, লাইকোপডিয়াম, নেট্রাম মিউর, ম্যাগ ফস প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ ও ওষুধের শক্তি নির্বাচন করেন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

সাবধানতা :

• ফল, সবজি, দানা জাতীয় শস্য খেতে হবে।

• ঠিকমতো রান্না করা, সিদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার।

• স্ট্রেস কন্ট্রোল করতে হবে।

• পেনকিলার খেতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

• ধূমপান, মদ্যপানের মতো অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

• ইনফেকশন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর রোগের কোনও উপসর্গ দেখলেই আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

(যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬)

বিরোধীদের ওপর শাসক দলের আক্রমণ।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এত অনিচ্ছা কেন?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিংহ রাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও একদিন বাড়ানো হলো। এই বাড়তি একদিন সময়ে চূড়ান্ত সন্ত্রাসের আবহে এই রাজ্যের বিরোধী প্রার্থীরা আর কতটুকু মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারতেন— সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তবু এই রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা এই ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, অন্তত শাসক দলের অগণতান্ত্রিক আচরণ, হম্বিতম্বি এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও রুখে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছেন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচন কমিশনারের এই রায়কে অনেকেই গণতন্ত্রের জয় বলে স্বাগত জানাতেও শুরু করেছিলেন। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাও কাটলো না। মাত্র বারো ঘণ্টার ভিতরই রাজ্যের বিরোধী দলগুলি এবং গণতন্ত্র প্রিয় নাগরিকদের চটকা ভেঙে গেল। রাতের নির্দেশ সকালেই বদলে দিলেন নির্বাচন কমিশনার। জানিয়ে দিলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও একদিন বৃদ্ধি করে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল— তা প্রত্যাহার করা হলো। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের এহেন ডিগবাজির ফলে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, অমরেন্দ্রকুমার শাসকের রক্তচক্ষুর সামনে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারেননি। রাজ্যের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ অমরেন্দ্রকুমারকে 'কাপুরুষ' আখ্যাও দিচ্ছেন। আসলে অমরেন্দ্রকুমারের বিজ্ঞপ্তি জারি এবং প্রত্যাহারের মধ্যবর্তী বারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটি নাটক সংঘটিত হয়েছে, যা হলিউডের হাড় হিম করা থ্রিলারকেও হার মানাবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়ে দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল শাসকদলের। শাসকের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করার এই সাহস তৃণমূলেশ্বরী এবং তাঁর পারিষদেরা ভালোভাবে নিতে পারেননি। ফলে, প্রথমে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পঞ্চায়েত সচিবকে দিয়ে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নিতে। মুখ্যসচিব এবং পঞ্চায়েত সচিব কী বলতে পারেন তা আন্দাজ করেই নির্বাচন কমিশনার তাঁদের ফোন ধরেননি। এরপর রাজ্যের তিন মন্ত্রী গভীর রাতে হাজির হন অমরেন্দ্রকুমারের বাড়িতে। ওই মন্ত্রীদের ভিতরই একজন একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রকে বলেছেন, 'আমরা তাকে নরম করে বুঝিয়ে দিই কেন মনোনয়নের দিন বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।' কতটা নরম করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা? সূত্রের খবর, ওই দিন মন্ত্রী অমরেন্দ্রকুমারকে বলেছিলেন, বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা না হলে তাঁর পুত্রের ব্যবসায় নানারকম অবাঞ্ছিত ঝামেলার সৃষ্টি করা হবে। এখানে বলা দরকার অমরেন্দ্রকুমারের ছেলে পেশায় ব্যবসায়ী। এমনও শোনা যাচ্ছে, ওই মন্ত্রীদের ভিতর কেউ

বিরোধীদের ওপর শাসক দলের আক্রমণ।

কেউ তাঁকে নাকি এমনও বলেছিলেন, ভূমিসচিব থাকার সময়ে মিথ্যা দুর্নীতির মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। আর কী কী, ঠিক কীভাবে নরম করে বলেছিলেন, তা অবশ্য জানা যাচ্ছে না।

রাতের এই ঘটনাটির সঙ্গে বিশিষ্ট রাশিয়ান বিজ্ঞানী আন্দ্রে শাখারভের আত্মজীবনী 'মেময়ার্স'-এর একটি অংশের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য পাচ্ছি। শাখারভ তৎকালীন কমিউনিস্ট শাসকদের বিরোধী ছিলেন। তাঁকে মস্কো শহর থেকে দূরে একটি মফঃসলে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে একটি ছোট্ট বাড়িতে শাখারভ, তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং দুটি ছোট নাতনিকে নিয়ে কার্যত গৃহবন্দি ছিলেন। বহির্জগতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে দেওয়া হতো না তাঁকে। ওই সময়ই একদিন রুশ গুপ্ত ঘাতক বাহিনী চেকার দুই অফিসার এসে শাখারভকে এই বলে শাসান যে, 'মনে রাখবেন, আপনার দুটি ছোট নাতনি আছে।' মেময়ার্স-এ এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে শাখারভ লিখেছেন— 'সেই প্রথম নাতনি দুটির কথা ভেবে আমার মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত বয়ে গেল।' তৃণমূলের তিন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রীর 'নরম কথা'র সামনে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমারের মেরুদণ্ড দিয়েও শীতল স্রোত বয়ে গিয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই।

তবে, এখানেও শেষ হলো না। পরদিন সাতসকালে রাজ্যের আর এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী দুই সতীর্থ-সহ হাজির হলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বাসগৃহে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘুম থেকে তোলা হলো। এবং আর এক প্রস্থ 'নরম' কথাবার্তা শোনানো হলো তাঁকে। সূত্রের খবর, এই দ্বিতীয় পর্বের 'নরম কথা'য় অমরেন্দ্রকুমারকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তিনি যদি বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে রাজি না হন, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের দামাল বাহিনী তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলবে। এবং সেক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নিরাপত্তা দেওয়ায় দায় সরকারের থাকবে না। এই হুমকিটি যে শুধু মৌখিক ছিল না, তা বোঝা গেল একটু পরেই। নির্বাচন কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সকালে নির্বাচনী অফিসাররা বিভিন্ন বিডিও অফিসে যান। কিন্তু কোনও বিডিও অফিসেই পুলিশ ছিল না। নির্বাচনী অফিসারদের জানিয়ে দেওয়া হয়, নবান্ন থেকে বলা হয়েছে কোথাও কোনও পুলিশ যাবে না। পুলিশ না থাকায় নিরাপত্তার অভাবে নির্বাচনী অফিসাররা কাজ বন্ধ করে দেন।

মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে পরপর দুবার এরকম 'নরম কথা'র মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিংহ আর মনোবল ধরে রাখতে পারেননি। তিনি বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নেন। সূত্র জানাচ্ছে, তারপর সারাদিনই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অমরেন্দ্রকুমার একাই কাটিয়েছেন। কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেননি। কথাবার্তাও বলেননি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেছেন, 'নির্বাচন কমিশনারকে মানসিক অত্যাচার করেছেন শাসক দলের নেতারা।' একই অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। আর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব অর্ধেন্দু সেন বলেছেন, 'মন্ত্রীরা কমিশনারের বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছেন শুনে আর অবাক হচ্ছি না। এটাই এগিয়ে বাংলার নমুনা।' এ রাজ্যে কর্মরত আমলারা অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন। একটি বহু প্রচারিত সংবাদপত্রে দেখলাম, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আমলা বলেছেন, 'জেলাশাসকের অফিসের সামনে ছুরি মারা শুরু করেছে। নবান্নের সামনে আসতে তা আর কতক্ষণ।'

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন আমলা দীপক ঘোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললেন, 'বিহারের নির্বাচন নিয়ে এক সময় সারাদেশ নিন্দা মন্দ করত। বোমা, বন্দুক, রিগিং, বুথ দখল, খুন-খারাপি ছাড়া বিহারে নির্বাচন হয় না— এই রকমই একটা ধারণা ছিল মানুষের। বাস্তবে তাই হতও বিহারে। তবু ওইরকম সন্ত্রাসের ভিতরও বিহারেও কিন্তু কখনও রাজ্যের মন্ত্রীরা নির্বাচন কমিশনারের বাড়ি গিয়ে তাঁকে শাসিয়ে নির্দেশ প্রত্যাহার করাননি। অন্য কোনও রাজ্যেও এরকম হয়নি কখনও। স্বাধীন ভারতের সত্তর বছরের রাজনীতির ইতিহাসে এরকম প্রথম ঘটল এই বাংলায়। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে—এগিয়ে বাংলা।' ওই আমলার আরও বক্তব্য—'যা ঘটল— এরপর বলতেই হচ্ছে এই রাজ্যে কোনও প্রশাসন নেই। যা চলছে তা নৈরাজ্য এবং জঙ্গলের রাজত্ব।'

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরুর অনেক আগেই এবার শাসক দল হুঙ্কার ছেড়েছিল বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত চাই। এই হুঙ্কারের পিছনে তৃণমূলেশ্বরীর সমর্থন যে ছিল না তা বলা যাবে না। তাঁর মৌন সম্মতিই পারিষদদের বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত দখল করতে উৎসাহিত করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে কোনওরকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই তাঁরা মান্যতা দেবেন না— তা মনোনয়নপত্র দাখিল করার অনেক আগে থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলেশ্বরীর অনুগামীরা। এই অনুগামীদের ভিতর আবার বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল, ওরফে কেষ্টা, 'কোড ল্যাঙ্গুয়েজে' কথা বলতে অভ্যস্থ। তাঁর সেই মনকাড়া কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কেষ্টা এবার মনোনয়নপত্র দাখিল পর্বের মুখেই বলে রাখলেন— 'বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলেই দেখবেন রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে।' কেষ্টা এর আগের নির্বাচনে বিরোধীদের গুড়জল খাওয়ানোর কথা বলেছিলেন। তখন ডি-কোড করে জানা গিয়েছিল গুড়-জল মানে বোমা পিস্তল। গুড়-জলের মতো উন্নয়নের জোয়ারও হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন কেষ্টা। এবারও মনোনয়ন পর্ব শুরু হতেই 'উন্নয়ন'-কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কোনও উন্নয়নের হাতে বোমা, কারও হাতে বন্দুক, কেউ বা চপার হাতে, কারও হাতে লোহার রড। বোলপুরে তো কয়েকজন উন্নয়নকে দেখা গেল মোটরবাইকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগিয়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরছে। জিগ্যেস করতেই কেষ্টার কোড ল্যাঙ্গুয়েজে জবাব— 'ওরা সব গ্রামের মানুষ। গ্রামে অস্ত্র শান দেওয়ার মেশিন নেই। তাই শহরে শান দিতে এসেছিল।' উন্নয়নের এই সশস্ত্র চেহারার ছবি বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশ পেয়েছে। তাদের তাণ্ডবের খবরও ফলাও করে প্রকাশ হয়েছে। বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠন করতে তারা রাস্তায় মহিলাদের শ্লীলতাহানি করতেও দ্বিধা করেনি। মনোনয়ন পর্বেই উন্নয়নের হামলায় দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। বহু বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। বহু বিরোধী দলের কর্মী-নেতার বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। সর্বত্রই পুলিশ নীরব দর্শক। বরং কিছু জায়গায় উর্দি পরে পুলিশ উন্নয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়েই বিরোধীদের ঠেঙিয়েছে। তবে, এতসব তাণ্ডব, নৈরাজ্য, সন্ত্রাসের মধ্যেও বীরভূমের একটি অঞ্চলে সশস্ত্র সাঁওতালদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে বীরপুঙ্গব উন্নয়নেরা পালিয়েছে। রাজ্যের এই সামগ্রিক পরিস্থিতিটা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই বুঝছেন, এই উন্নয়ন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের মনে গণতন্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তো দূর অস্ত। এরা জন্মেছে গণতন্ত্রকে পদলেহন করার জন্য। নির্বাচন কমিশনারকে হেনস্থা করে এরা এদের চরিত্রকেই প্রকাশ করেছে।

কিন্তু তৃণমূলেশ্বরী? যিনি নাকি গণতন্ত্র বাঁচাতে ভিন রাজ্যে জোট গড়তে ছুটছেন— তাঁর রাজ্যে গণতন্ত্র ধর্ষিত হওয়ায় তিনি নীরব কেন? কেন তাঁর নির্দেশে তাঁর অনুগামীরা ছুটে যাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনারকে ভয় দেখাতে? যদি সত্যই উন্নয়নের দুগ্ধ-মধু প্রবাহিত হয়ে থাকে এই রাজ্যে তাহলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এত অনিচ্ছা কেন তৃণমূলেশ্বরীর? নাকি এক ভয় তাড়া করছে তাঁকে? পায়ের নীচে মাটি সরে যাওয়ার ভয়।

রক্তাক্ত পঞ্চায়েতের বলি অজিত মুর্মু।

মানুষ সুযোগ পেলেই মমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে

সাধন কুমার পাল

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে যেন গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ২ এপ্রিল মনোনয়ন পর্ব শুরুর দিন থেকেই রণভূমি হয়ে উঠেছে রাজ্যের বিডিও অফিসগুলি। টেলিভিশনের পর্দা, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রক্তাক্ত মুখ, বোমা, গুলি, ধারালো অস্ত্র হাতে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের ছবি। এই সমস্ত ছবি দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামের মানুষের ক্ষমতায়ন নয়, ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের অস্ত্রায়নের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুলিশ নির্বিকার। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল ও প্রশাসন যেন যৌথ ভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হত্যায় মেতেছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শুরুর দিকেই বাঁকুড়ার বিজেপির দলিত প্রার্থী অজিত মুর্মুকে কুপিয়ে খুন করল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। বিজেপির মনোনয়ন প্রক্রিয়া ভণ্ডুল করতে রায়গঞ্জ-সহ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে বোমা বন্দুক নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। প্রকাশ্য দিবালোকে আরামবাগ মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে মনোনয়ন জমা দিতে আসা মহিলাদের মারধর ও শ্লীলতাহানির দৃশ্য টেলিভিশনে দেখে সবাই শিউরে উঠেছে। ভোটগ্রহণ তো অনেক দূরে কথা, নির্বাচনী প্রচার পর্বও তখন সে ভাবে শুরু হয়নি। সবে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তাতেই যে পরিমাণ হিংসা দেখছে গোটা বাংলা, তা অন্যান্য রাজ্যে তো বটেই, এ রাজ্যেও বামেদের তৈরি রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে।

চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গে যে অন্ধকার যুগের অবতারণা হয়েছিল, মমতার শাসনে সেই অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। আমজনতা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। বামেদের বিরুদ্ধে জেহাদিদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের অভিযোগ ওঠেনি। এই লেখা লেখার সময় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ আসছে যে, জেহাদিরাও নাকি তৃণমূলের হয়ে অস্ত্রহাতে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সীমান্ত এলাকাগুলিতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ভোট করানোর জন্য বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করছে।

বাংলার সংস্কৃতির মিথ্যা অহঙ্কার ছেড়ে এবার বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গণতন্ত্রের ব্যবহারিক রূপটা আসলে কী বা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটা ঠিক কীরকম, সেসব একটু চোখ খুলে দেখে নেওয়া দরকার। পাশের রাজ্য বিহার অসম থেকেও গণতন্ত্রের

আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি বিরোধী দলের মহিলারাও।

শিক্ষাটা নেওয়া যেতে পারে। আজকে যে প্রজন্ম পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করছেন তাদের সিংহ ভাগেরই জন্ম অথবা জ্ঞান বুদ্ধির উন্মেষ সবই বামেদের অন্ধকার যুগে। বামেদের চৌত্রিশ বছর ও ইন্দিরা গান্ধীর কুখ্যাত জরুরি অবস্থার মন্ত্রে দীক্ষিত মমতা ব্যানার্জির সাত বছর মিলে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর অবাধ ধ্বংস লীলা চলেছে। কুয়োর ব্যাঙের মতো এই প্রজন্মের কাছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই ধ্বংস লীলাই রাজনীতিকদের প্রকৃত রাজনৈতিক জীবন শৈলী মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আমার তো মনে হয় এই ধরনের জটিল ও বিকৃত মনস্তত্ত্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্তির পথ একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির মতো দেশের ২২টি রাজ্যে ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সর্বভারতীয় দলই দেখাতে পারে। কাজটি কঠিন ও সময় সাপেক্ষ, কারণ যাদের দিয়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে তাদের জন্মও এই ব্যবস্থাতেই।

এক সময় বাংলা নেতৃত্ব দিয়েছিল সমগ্র ভারতকে। অতএব, বাংলায় গণতন্ত্রের সংস্কৃতি কখনও ছিল কি না, বাংলা আদৌ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কিনা, এসব প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখন সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত, তা নিয়েও কোনও সংশয় নেই। শুধু আমজনতা নয় বর্তমান হিংসার পরিস্থিতি দেখে অসহায় বোধ করছেন স্বয়ং রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র সিংহ। ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর অসহায়তা ব্যক্ত করেছিলেন। মনোনয়ন পর্ব শুরু হওয়ার পর ফের রাজভবনে গিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিংহ রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীকে বলে এসেছেন, অভিযোগের বন্যায় তিনি দিশাহারা। রাজ্যপাল তাঁকে পদের মর্যাদা বজায় রেখে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

অতএব, বাংলাকে আবার নতুন করে নিতে হবে গণতন্ত্রের পাঠ। অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচন কোন উপায়ে অবাধে, শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে মিটে যায়, বাংলার মানুষকে তা বোঝার চেষ্টা করতেই হবে। কারণ এখন বাংলায় যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে, কোনও সভ্য

রক্তাক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাক্ষী।

দেশে এই ভাবে নির্বাচন হতে পারে না।

পঞ্চায়েতের বরাদ্দ দিয়ে কীভাবে পার্টির সংগঠন ধরে রাখতে হয়, ক্যাডার পালন করতে হয় তার বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি সিপিএম দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বাম জমানার লুটেরার দল এখন রং পাল্টে আরও অনেক বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে নিখুঁত কাগজপত্র বানিয়ে লুটপাট চালাচ্ছে। এরকমই একটি নিখুঁত লুটের ঘটনা উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কোচবিহারের গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে কাজ না করে কাজ করা হয়েছে বলে খাতায় কলমে দেখিয়ে খালের জন্য বরাদ্দ ৪২ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। গত ৩ এপ্রিল গ্রামবাসীরা (পড়ুন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী) কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে এই সম্পর্কিত একটি অভিযোগ জমা দিয়েছে। প্রধান আমিনুল হকের বক্তব্য, নিয়ম মেনেই তারা খাল কাটানোর কাজ করিয়েছিলেন, কিন্তু নদীর গতি পথ পরিবর্তনের জন্য তা বালি-মাটিতে ভরে গিয়ে জায়গাটা আগে যেরকম ছিল ঠিক সেই রকমই হয়ে গিয়েছে। ফলে এখন সেখানে আর খাল বোঝা যাচ্ছে না। ভারত সরকারের রুরাল ডেভেলপমেন্টের ফান্ডের টাকায় দরিবস ক্যাম্প থেকে সেতুর মাথা পর্যন্ত ক্যানেল তৈরির জন্য ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। ২০১৭ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবরের মধ্যে ওই খাল তৈরির কথা ছিল। আবু আলি, আয়ুব আলি, জাহির আলির মতো সমস্ত গ্রামবাসীর বক্তব্য ওই জায়গায় কোনওদিন কোনও খাল কাটা হয়নি। ওই গ্রামের যারা একটু খোঁজ খবর রাখেন তাদের বক্তব্য খাল তৈরির জন্য ৪২ লক্ষ টাকা অবৈধ ভাবে মাস্টার রোল করে খরচ হয়ে গিয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। ক্যানেল তৈরির পুরো টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও তাঁর সাকরেদরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এরকম সংগঠিত লুটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এই লুটের টাকার একটি বড় অংশ কমিশন হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পার্টির কেন্দ্রীয় ফান্ডে। ফলে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতে নয় সর্বক্ষেত্রেই দুর্নীতিই এখন এ রাজ্যের নীতি। বলার অপেক্ষা রাখে না, পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে এই সোনার খনি দখলে রাখতেই এই গৃহযুদ্ধের আয়োজন। আইনের শাসন ভেঙে পড়ছে দেখে শুধু আমজনতা নয় ক্ষোভের আগুন পুঞ্জিভূত হচ্ছে প্রশাসনের মধ্যেও। মানুষ যে এই সরকারকে ছুঁড়ে ফেলতে চায় সেটা মমতার মতো ধুরন্ধর রাজনীতিকের না বোঝার কথা নয়। মানুষের অপছন্দ হলেও সন্ত্রাস করেও যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় বামেরা সেই পথ দেখিয়ে গিয়েছে। তৃণমূল নেতাদের প্রকাশ্য আস্ফালন দেখলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বামেদের মতোই সন্ত্রাস করেই দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় টিকে থাকার নীতিই এখন মমতা ব্যানার্জির নীতি।

ফলে মানুষের প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে এই খুনি লুটেরাদের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে বলে মনে হয় না। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ যেভাবে রুখে দাঁড়াচ্ছে তাতে প্রচুর রক্ত ঝরার সম্ভাবনা। ফলে বাংলার চিন্তাশীল অনেক মানুষকেই বলতে শোনা যাচ্ছে একমাত্র কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপেই এই রক্তপাত বন্ধ করতে পারে। কংগ্রেস ও বামেরা প্রায় নিশ্চিহ্ন, মনোনয়ন পেশের পরিসংখ্যান ও সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত ঘটনাবলী বলছে একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে মানুষের একমাত্র ভরসা বিজেপি। ফলে যতটা প্রতিবাদ প্রতিরোধ হচ্ছে, সেটা একমাত্র বিজেপির নেতৃত্বেই। ■

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মুসলমানরা শুধুই ভোটার

সুদীপ ঘোষ

দেখতে দেখতে রাজ্যে আর একটি পঞ্চায়েত ভোট চলে এল। সময় হয়েছে বিগত ৫ বছরের যাবতীয় হিসেব-নিকেশ নেওয়ার। তার আগে আসুন একটু পিছনের দিকে তাকানো যাক। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ অবধি এরাজ্যে মূলত কংগ্রেসের শাসন ছিল। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে মানুষ বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েতিরাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিকে সিপিআইএম দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নেতাদের দলে পরিণত হয়। তাই মানুষ ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনে। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দিয়েছিলেন 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে বর্তমানে ২০১৮ সাল অবধি আমরা দেখলাম এর উল্টো ঘটনাটাই প্রতিনিয়ত রাজ্যে ঘটে চলেছে। শুধুমাত্র বিরোধিতা করার অপরাধে উনি বিজেপির নেতা-কর্মীদের প্রশাসনের সাহায্যে দমনের নীতি নিলেন। রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে হত্যা করে উনি বিরোধীদের মিথ্যা অভিযোগে লক-আপে ঢোকানো শুরু করলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডাররা পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মারধোর, এমনকী প্রাণ নাশের মতো ঘটনা ঘটাতে শুরু করল। শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে তারা সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে।

কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিল্প সম্মেলন হয়ে গেল। শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ ব্যবহার করে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করলেন 'বছরে ৮১ লক্ষ চাকরি দিয়েছি', 'রাজ্যে ১০০ কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে'। এগুলির সত্যতা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ১০ কোটির কিছু বেশি। প্রত্যেক বছর এরকম কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিনিয়োগের কথা বলা হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। বিরোধী নেত্রী থাকার সময় উনি টাটাদের ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত করেছেন শুধুমাত্র নিজের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। পরিতক্ত সেই কারখানার জমিতে সর্ষের বীজ ছড়িয়ে উনি বিভিন্ন জায়গায় শিল্প সম্মেলন করছেন— মানুষ কী বিশ্বাস করবে?

গত সাত বছরে একটি কারখানাও খোলেনি। বামফ্রন্ট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া

৫৩ হাজার কলকারখানার একটিও খোলেনি। প্রাপ্য ডিএ থেকে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করেছেন। এস এস সি নিয়মিত হয় না। কর্মচারীদের বেতনের ১২০০০ হাজার কোটি টাকা খরচ না করে সেই টাকায় মেলা, খেলা, উৎসব করছেন। ক্লাবকে টাকা দিয়ে খেলশ্রীর নামে গুণ্ডা পুষছেন। ইনফোসিস-এর মতো প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা রাজ্যছাড়া। কোনও নির্দিষ্ট ল্যান্ড ব্যাঙ্ক নেই। শুধু গ্রিন পুলিশ আর তেলেভাজা। এভাবে চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিন্তু তাঁকে ক্ষমা করবে না।

এবার আসি এরাজ্যে মুসলমান ভাইদের দুর্দশা প্রসঙ্গে। সাচার কমিটির রিপোর্টে তাদের যে দুদর্শার কথা ফুটে উঠেছে তার জন্য কে দায়ী? কারা ৭০ বছর ধরে রাজ্যে প্রশাসন চালিয়েছে? মোদীজি বলেছেন— 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'। উনি মুসলমান মহিলাদের তিন তালাক বিলের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছেন। হজের ভরতুকির টাকা বন্ধ করে সেই টাকা মুসলমান মহিলাদের মানোন্নয়নে সাহায্য করেছেন। ইমামদের ভাতা দিয়ে, মুসলমান মৌলবাদীদের তোষণ করে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান সমাজকে শুধু ভোটার করে রেখেছেন। তাই এবার তাদেরও জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। কেন্দ্রের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প যেমন গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, ২ টাকা কেজি চাল ও ২ টাকা কেজি গম, শৌচালয় নির্মাণ, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও বৈদ্যুতিকরণ— প্রকল্পগুলির নাম চুরি করে নিজেদের বলে চালাচ্ছেন। প্রতি পদে পদে কেন্দ্র বঞ্চনা করছে বলে উনি মন্তব্য করছেন। কিন্তু এ রাজ্যে বিজেপি বরাবর দায়িত্বশীল বিরোধীর ভূমিকা পালন করেছে। রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে বিজেপি বরাবর রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করছে।

সবশেষে একটা কথা বলতে চাই— 'মনে ঘৃণা হিংসা নিয়ে রাজধর্ম পালন করা যায় না'— এটা উনি কবে বুঝবেন? যেদিন বুঝবেন সেদিন হয়তো আর সাধারণ বিজেপি কর্মীদের লাশের বোঝা আমাদের বইতে হবে না। উনি কোনও দলের মুখ্যমন্ত্রী নন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী— এই সত্যিটা উপলব্ধি করতে না পারা পর্যন্ত রাজ্যের দুর্দশা ঘুচবে না। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বে রাজ্য জুড়ে যে অরাজকতা দেখছি, তাতে ঘোর অনিশ্চয়তার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

আদালতের নির্দেশে গণতন্ত্রের জয় দেখছে বিরোধীরা

চন্দ্রভানু ঘোষাল

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া। রাজ্য নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন পত্র জমা দেবার মেয়াদ একদিন বাড়িয়েও যেভাবে নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে, তাতে আদালত অসন্তুষ্ট। ১৬ তারিখ পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনি করার কাজ করা যাবে না বলে আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলি আদালতের এই নির্দেশে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি হয়েছিল। এই নির্দেশকে 'তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়' বলে বর্ণনা করেছেন অনেকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র দাবি করা হয়েছে নানা মহল থেকে। আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, যে যুক্তিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ায় বাধাদান এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। নির্বাচন পরিচালনা করা যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাজ, কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও বিচ্যুতি ঘটলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিজেপির আবেদনের ভিত্তিতে রায় দিয়ে বিচারক সুব্রত তালুকদার জানান, আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে। তাঁর মতে, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার মেয়াদ একদিন বাড়ানোর অর্থ রাজ্য নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিরোধী দলগুলির অভিযোগের সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, 'অথচ দেখা গেল কমিশন আকস্মিক ভাবে নিজেদের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিল।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের গুণ্ডাদের আক্রমণে আহত রক্তাক্ত বিজেপি নেতা কালোসোনা মণ্ডলের ছবি প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটি সংবাদপত্রে। খুন হয়েছেন বাঁকুড়ার বিজেপি নেতা অজিত মুর্মু। মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সিপিএমের প্রবীণ নেতা বাসুদেব আচার্য। বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের বহু ঘটনা ঘটলেও, বিরোধী প্রার্থীদের খুন করার ঘটনা কখনও ঘটেনি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত, বাম আমলে নীচুতলার লুম্পেনরা জানত মাথার ওপর যারা আছেন তাঁরা লুম্পেন নন। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখন একটা কানাগলির লুম্পেনও জানে পার্টি এবং প্রশাসনের শীর্ষে যারা আছেন তারা তাদের থেকেও বড়ো লুম্পেন। ফলে কোথাও কোনও রাখঢাক নেই। যে যা পারে তাই করে। এবং তার কোনও প্রতিকারও হয় না।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ জারি করে আদালত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেনি। শাসক এবং বিরোধী দল যাতে সমান সুযোগ পায় তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল। ১৬ এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে প্রাক্-নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটা স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই রিপোর্টে মোট কতগুলি মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে এবং কতগুলি বাতিল হয়েছে তার বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।

আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলি। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন, 'বিরোধীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে চাইছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের রায়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গণতন্ত্র জয়ী হলো।' অন্যদিকে তৃণমূলের মহাসচিব এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের রায় নিয়ে কিছু বলব না। আইন আইনের পথে চলবে। বিরোধীদের কোনও জনভিত্তি নেই, তাই কথায় কথায় আদালতে ছোটে।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যাই বলুন বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিজেপির যে জনভিত্তি রয়েছে তার প্রমাণ গত বছর রামনবমীর শোভাযাত্রা থেকেই পাওয়া গেছে। তাছাড়া জনভিত্তি না থাকলে বিজেপির নেতাকর্মীদের তৃণমূলের কর্মীদের হাতে মার খেতে হতো না। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণনীতি হলো অতীতকে ধ্বংস করো এবং ভবিষ্যতকে আটকাও। পশ্চিমবঙ্গের অতীত মানে সিপিএম আর ভবিষ্যৎ মানে বিজেপি। মমতা ভালোই জানেন ২০১১ সালে সিপিএমের মতো একটি ক্যাডারভিত্তিক দলকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তিনি আবার ক্যাডার-ভিত্তিক আর একটি দলের মুখোমুখি। লড়াই সহজ হবে না। কারণ ২০১১ সালেও তৃণমূল দলে একজনই নেতা ছিলেন, এখনও তাই। কর্মীরা জানেন তাদের কোনও ইতিহাস নেই, পরম্পরা নেই— শুধু একজন মমতা আছেন। অন্যদিকে সারা দেশে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে বিজেপি প্রাণিত, উজ্জীবিত। তার ওপর নরেন্দ্র মোদীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। সব দেখে শুনে মমতা ভয় পেয়েছেন। তাই এত মারধর, হানাহানি। প্রশ্ন হলো, তাতে লাভ হবে কী? বিশেষ করে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে? ■

বিনসরের দু'রাত

বর্ণালী রায়

ভারতবর্ষের প্রতিটি ছত্রে লুকিয়ে আছে সৌন্দর্য। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, সমুদ্র সবকিছুর এক মিলিত আধার। ইতিহাস, পুরাণ আর তার সঙ্গে তাক লাগানো রূপমাধুর্য। যেখানে মানুষ প্রকৃতির কোলে নিবিড়তা খুঁজে ফেরে।

উত্তরাখণ্ডের দুটি প্রশাসনিক বিভাজনের মধ্যে একটি কুমায়ুন, অন্যটি হলো গাড়োয়াল। কুমায়ুন একটি পাহাড়ঘেরা রাজ্য। আলমোড়া, বাগেশ্বর, চম্পাবত, নৈনিতাল, পিথরাগড় আর উধম সিংহ নগর জেলাগুলিতে বিভাজিত এই কুমায়ুন রাজ্যটি। আলমোড়া থেকে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার দূরে বিনসর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির অবস্থান। হিমালয়ের ঝান্ডিধার পর্বতের মাথায় এর অবস্থান। ১৯৮৮ সালে এটি প্রথম সংরক্ষিত অঞ্চলের তকমা পায়। প্রায় ৪৫.৫৯ স্কোয়ার কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে এই বনভূমি। দিল্লি থেকে সড়ক পথে বিনসরের দূরত্ব ৩৮৬ কিলোমিটার। কাঠগোদাম, ভাওয়ালি, খৈরিনা, আলমোড়া হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় বিনসর। আর রেলপথে কাঠগোদাম স্টেশনে নেমে গাড়িতে যাওয়া যায়।

বিনসর পৌঁছানোর রাস্তাটা এত সুন্দর আর বৈচিত্র্যময় যে মনের মধ্যে একই সাথে আনন্দ আর রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। দিল্লি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে যদিও সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিনসরের জঙ্গল দেখতে যাব বলে। কিন্তু পথের আসল দূরত্বের থেকেও এর দুর্গম আর পাকদণ্ডীময় রাস্তা চলার পথকে আরো দীর্ঘ করে তুলছিল। আলমোড়া পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে সন্ধ্যে ছটা। চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। তার মধ্যে গাড়ির ড্রাইভার পথ হারিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘন জঙ্গলের রাস্তায়। বন্য জীবজন্তুর ডাক ভেসে আসছে কানে। চারিপাশে শুধুই জঙ্গল। কোনও লোকালয় চোখেই পড়ছে না। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চক্কর কেটে পৌঁছলাম ফরেস্ট চেক পোস্টে। আসলে খুব দ্রুত বিনসরের প্রোগ্রাম করেছি বলে সরকারি ফরেস্ট বাংলোতে থাকার জায়গা মেলেনি। আমি যাব বিনসরের জঙ্গল-ঘেঁষা বাফার জোনের গ্রাম ধৌলচিনার একটা রিসর্টে। রাতটা ওখানেই থাকা। প্রথম দিনটা বিনসর ফরেস্ট রেস্ট হাউসে বুকিং পাইনি। চেকপোস্ট থেকে যা বলল আমরা প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা এগিয়ে এসেছি। আবার সেই জঙ্গলের পথ। ভেবেই বুকের ভিতরটা কেমন হতে লাগল। যাই হোক রাস্তা চিনে যখন রিসর্টে ঢুকলাম তখন ঘড়িতে রাত ৭.৩০ মিনিট। আট কিলোমিটার রাস্তা যেন এক যুগ পেরিয়ে পৌঁছেছি। যাই হোক, ঘরে ঢুকে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম। সারাদিনের ক্লান্তি ঘুচে গেল ওদের আতিথেয়তায়।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে চোখে পড়ল দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় আর সবুজ জঙ্গল কুয়াশায় ঢেকে আছে। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিটাতে বেশ কিছুক্ষণ বসলাম। একটু একটু করে সূর্যের আলোর ছটা কুয়াশার বুক চিরে বেরিয়ে আসছে, চারিদিকের ঝাপসা প্রকৃতি একটু একটু করে যেন লেপের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে। নিবিড় প্রকৃতির মাঝে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিনসর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির দিকে। কাল যে জঙ্গলের পথে এসেছিলাম, আজ দিনের আলোতে তার রূপ দেখতে পেয়ে কেমন যেন কেঁপে উঠছে বুকটা। ওক, রোডোডেন্ড্রন গাছের ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও আলো পর্যন্ত প্রবেশ করছে না। গাছের গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সে দাঁড়িয়ে আছে অনেক কিছুর সাক্ষী হয়ে। গাড়ি এসে থামলো ফরেস্ট চেকপোস্টের সামনে। এখান থেকে টুরিস্ট রেস্ট হাউসের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। ওই পর্যন্তই গাড়ি যাওয়ার অনুমতি মেলে। গাড়ি আর নিজের জন্য এন্ট্রি পাস করার পর গাড়ি ছুটে চলল রেস্ট

হাউসের দিকে। শুনছিলাম এই পুরো এলাকায় ফরেস্ট বাংলো ছাড়া কয়েকটিমাত্র প্রাইভেট প্রপার্টি আছে। ড্রাইভারের মুখেই শুনছিলাম, বিনসর ব্রিটিশদেরও খুব পছন্দের জায়গা ছিল। বিনসরের আদিম আনকোরা প্রকৃতির স্বাদ নিতে এখানে তারা নিজস্ব মালিকানাধীন এস্টেট তৈরি করে। ড্রাইভার বলল, যাবেন নাকি একবার দেখতে? আজকাল টুরিস্টদের থাকার জন্য কয়েকটা প্রাইভেট এস্টেট তৈরি হয়েছে। যদিও আমার আজ রাতের বুকিং ফরেস্ট বাংলোতে, তবু দেখতে যাবার সুযোগটা ছাড়তে চাইলাম না। বাড়িগুলো সবই ব্রিটিশ ধাঁচের আর্কিটেকচার। বেশ দারুণ জায়গাটা। ঘন জঙ্গলের মাঝে, পাহাড়ের কোলে একটা পাথরের তৈরি গেস্ট হাউস। এস্টেটের কেয়ারটেকারের সঙ্গে আমার গাড়ির ড্রাইভার দাদাটির বেশ বন্ধুত্ব দেখলাম, তাই তার সৌজন্যে জুটে গেল এক কাপ চা। বছর ষাটেকের একজন মানুষ। দাজু দাজু বলে ডাকে সবাই। তিনিই বলছিলেন, ওনার পরিবারের পঞ্চম পুরুষ তিনি। ১১শো থেকে ১৮শো শতাব্দীতে যে চাঁন্দ রাজারা কুমায়ুনে রাজত্ব করেছিলেন, বিনসর ছিল তাদেরই গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরাও এসে থাকতে শুরু করে। পুলিশ কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, আর্মি অফিসাররা কলোনিয়াল বাংলো তৈরি করে থাকতে শুরু করেন। স্বাধীনতার পর তারা যখন দেশ ছেড়ে চলে যান তখন বেশির ভাগ সম্পত্তিই আলমোড়ার শাহ পরিবারকে দিয়ে যান। এখানে আরো বহু বিখ্যাত মানুষজন নিভৃতে সময়যাপনে এসেছেন। কথা বলতে বলতে ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ৯টা। এবার উঠতে হবে। নমস্কার বিনিময় করে উঠে এলাম। আসার পথে দেখলাম আরো এক দুটি প্রাইভেট রিসোর্ট হয়েছে।

এখান থেকে বেরিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ফরেস্ট বাংলোতে। চেক ইন করে আবার বেরিয়ে পড়লাম জিরো পয়েন্টের দিকে। সঙ্গে গাইড পুরাণ সিংহ। সে চলল জঙ্গলের নানা গল্প বলতে বলতে। এই জঙ্গলে নাকি প্রায় ২৫টি প্রজাতির গাছ-গাছালি, ২৪ রকমের ঝোপ, ৭ ধরনের ঘাস আছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম পশু পাখির কথা। বলল, Leopard, Musk Deer, Jungle Cat, Wild Boar, Red Fox, Gray Langur ইত্যাদি পশু দেখা যায়। আর পাখিদের মধ্যে Tits, Forktail, Black Birds, Magpies, Monal আরো অনেক আছে। জঙ্গলের পথে হেঁটে চলেছি, দেখে মনে হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন এক পথ তার চারপাশ ঘিরে বুড়ো গাছেরা নজরদারি চালাচ্ছে। এই জঙ্গলে অনেক ঔষধি গাছপালাও আছে। আর জঙ্গলের গাছের ফাঁক দিয়েই মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি। কথা বলতে বলতে কখন যে ২ কিলোমিটার পথ হেঁটে ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে গেছি বুঝতেই পারিনি। এখানে কুমায়ুন বিকাশ মণ্ডলের তরফে একটা ওয়াচ টাওয়ার করা আছে। কুমায়ুনের সর্বোচ্চ পয়েন্ট এটি। গাড়োয়াল হিমালয়ের যমুনোত্রী থেকে নেপালের মাউন্ট নেম্ফা পর্যন্ত সমস্ত পাহাড় দেখা যায় প্রায় ৩৫০ ডিগ্রি কোণে। নন্দাদেবী, নন্দাকোট, ত্রিশূল, কেদারনাথ, পঞ্চচুল্লি পর্বতের অবর্ণনীয় রূপ। পাহাড়ের গায়ে পাহাড় বরফ মোড়া। আর নিজে দাঁড়িয়ে আছি সবুজের রাজ্যে। পূর্ব, পশ্চিম আর দক্ষিণ এই তিন দিকের সব উঁচু উঁচু পাহাড়ের গায়ে সূর্যের আলো পড়ে চিক চিক করছে। আর হিমশীতল বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে এত দূর হেঁটে আসার ক্লান্তিকে ম্লান করে দিয়ে।

সেদিন ফরেস্ট বাংলোর রাতটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বাংলোটার বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। জঙ্গলের স্বার্থেই বর্জন করা হয়েছে নগরায়ণ। তাই প্রায় সন্ধ্যে রাতেই মিটে গেল রাতের খাওয়া দাওয়া। তারপর যে যার মতো। একবার বাংলোর বারান্দায় এসে দেখলাম নিঝুম প্রকৃতিকে, উপরে দিগন্ত আকাশের তারারা পাহারা দিচ্ছে আমাদের। বিছানায় শুয়ে কানে আসতে লাগল কতরকম আওয়াজ। সেসব শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

যাওয়ার পথ : কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে কাঠগোদাম/লালকুঁয়া পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি করে বিনসর পৌঁছানো যায়। আবার দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি/বাস/ট্রেনে কাঠগোদাম পৌঁছেও বিনসর যাওয়া যায়।

থাকার ব্যবস্থা : বিনসর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে KMVN এর FRH একমাত্র থাকার জায়গা। বুকিং অনলাইন বা কলকাতা অফিস থেকে।

এছাড়া জঙ্গলের বাইরে ও ধৌলচিনাতে থাকার জন্য প্রাইভেট কিছু রিসর্টও আছে। ■

সনাতন ধর্মের স্তম্ভ আচার্য কুমারিল ভট্ট

শুভ্রা দে

সনাতন ধর্মের ইতিহাসে আচার্য শঙ্কর নামটি সকলেরই সুপরিচিত। অষ্টম বর্ষীয় বালক শঙ্কর মায়ের কাছে সন্ন্যাসের অনুমতি নিয়ে পাড়ি দেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বৈদিক ধর্ম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে। অষ্টম বর্ষেই মৃত্যুযোগ ছিল তাঁর। মহাদেবের আশীর্বাদে স্বল্পায়ু পণ্ডিত পুত্রকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে মা একরকম বাধ্য হয়েই অনুমতি দিয়েছিলেন সন্ন্যাসের। আঁতুড় সন্ন্যাস নেওয়ার ফলে অষ্টম বর্ষের মৃত্যুযোগ ভগবৎ ইচ্ছাতেই কেটে গেল। দক্ষিণ ভারত থেকে ক্রমাগত উত্তরের দিকে ধাবিত হয়ে বালক সন্ন্যাসী উপনীত হলেন নর্মদাতীরস্থ ওঙ্কারনাথে। এরপর গুরু গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন শঙ্কর। ক্রমশ হঠযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হলেন তিনি। ধ্যানবলে সমাধিস্থ হয়ে নিত্য নব দিব্যানুভূতিতে শঙ্করের মন সর্বদা এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করে। তাঁর মনের সহজ গতি সমাধির দিকে। ক্রমে তাঁর মন অধিরূঢ় হলো নির্বিকল্প ভূমিতে। গোবিন্দপাদ বুঝলেন যে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রতী শঙ্করকে আদেশ দিলেন বারাণসী যাওয়ার জন্য। সেই মতো কতিপয় সন্ন্যাসী নিয়ে শঙ্কর এসে অবস্থান করলেন মণিকর্ণিকার নিকট। নিত্য গঙ্গাস্নান ও অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ দর্শন করেন আর ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এরপর শঙ্করকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মের ইতিহাসে ঘটেছে অনেক অলৌকিক ঘটনা। প্রবন্ধের প্রাণকেন্দ্র আচার্য কুমারিল ভট্ট হওয়ায় সেই সবের উল্লেখ এই প্রবন্ধকে অনর্থক বিস্তার করবে মাত্র। কাশীধাম থেকে বদ্রিনাথ, হৃষীকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কেদারনাথ আদি দুর্গম তীর্থস্থল অতিক্রম করে ষোড়শবর্ষীয় শঙ্কর এসে উপনীত হলেন উত্তরকাশিতে। এরই মধ্যে শঙ্কর বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব রচনা করলেন এবং অনেক লুপ্ত তীর্থস্থান পুনরুদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। শঙ্করের উত্তরকাশিতে অবস্থান করাকালীন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শঙ্করের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলেন। শিষ্যদের কাছে শঙ্করকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার জেনে শঙ্করকে বিভিন্ন সূত্রের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে বললেন। শঙ্করও বিনা দ্বিধায় শান্ত ভাবে উত্তর দিতে লাগলেন ব্রাহ্মণের সব প্রশ্নের। ব্রাহ্মণের শঙ্করের বেদান্তের ব্যাখ্যা খণ্ডন ও শঙ্করের ধীরভাবে তাঁর পুনর্স্থাপনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল বিচার ও আলোচনা। উভয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি, মেধা, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচার নৈপুণ্য শিষ্যগণকে স্তম্ভিত করেছে। এই ভাবে সাতদিন ধরে চলল সেই তুমুল বিচার। শঙ্করের কোনও কোনও জীবনীগ্রন্থে আচার্য ও ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ জটিল বিচারের বিবরণ প্রশ্নোত্তররূপে পাওয়া যায়। সপ্তম দিবস অতিবাহিত হলে শঙ্কর সমেত তাঁর শিষ্যরা অনুমান করলেন যে এমন বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ববেত্তা একমাত্র মহর্ষি বেদব্যাস ছাড়া আর কারও হওয়া সম্ভব নয়। অষ্টম দিবসের সকালে ব্রাহ্মণ শঙ্করকে এক জটিল প্রশ্ন করলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণের পাদবন্দনা করে সশ্রদ্ধ বিনীত ভাবে বললেন, ''মহাত্মন! প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে আপনার চরণে একটি নিবেদন আছে। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস যে আপনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কোনও দেবকার্য সাধনের উদ্দেশ্যে অন্য মূর্তি ধরে আমাদের সঙ্গে ছলনা করছেন। যদি আপনি মহামুনিই হয়ে থাকেন তবে আপনি আপনার স্বরূপ প্রকটিত করে আমাদের ধন্য করুন''। এরূপ প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, ''তোমার অনুমান সত্য''। এই বলে তিনি তাঁর বিদ্যুৎকান্তি মেঘতুল্য কৃষ্ণকায় বিশালবপু রূপ ধারণ করে প্রসন্ন বদনে শঙ্করকে অনেক আশীর্বচন প্রদান করলেন। শঙ্করের অষ্টমবর্ষের আয়ুর্বৃদ্ধির কাল শেষ হওয়ায় তিনি দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্যাসদেব তাতে অসম্মতি জানিয়ে বললেন যে, শঙ্করের কাজ এখনও বাকি আছে। ভারতের প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের বিচারে পরাভূত করে স্বমতে আনয়নের কার্য এখনও অসমাপ্ত এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধান পূর্ব মীমাংসক আচার্য কুমারিল ভট্টকে পরাজিত করাই তাঁর প্রথম কাজ। এই বলে আরও অনেক আশীর্বাদ সহ শঙ্করের আয়ু আরও ষোল বৎসর বৃদ্ধিপ্রাপ্তের আশীর্বাদ দিয়ে বেদব্যাস অন্তর্ধান হলেন।

সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা প্রসূত অসংখ্য মতবাদ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন শৌর্য, গাণপত্য, ভারতী আদি যখন একে অপরের বিরুদ্ধে সরব এবং বৌদ্ধধর্মের বেদের কর্মকাণ্ডের অপব্যাখ্যায় যখন সনাতন ধর্ম পঙ্গু ও জর্জরিত, তখন আবির্ভাব শঙ্করের। ষোড়শ বর্ষীয় শঙ্কর ব্যাসদেবের আশীর্বাদে রওনা দিলেন ভারত বিজয়ে। সনাতন ধর্মকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে, সনাতন ধর্মের অসংখ্য মতবাদকে এক ছত্রের তলায় আনয়নের লক্ষ্যে। ব্যাসদেবের আদেশানুসারে শঙ্কর এলেন প্রয়াগে, কুমারিল বিজয়ে। সেই সময়ে সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন আচার্য্য কুমারিল ভট্ট। গৌতম বুদ্ধের মতবাদ ও আদর্শের অপব্যাখ্যাতে গোটা বৌদ্ধ ধর্ম তখন কালিমালিপ্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রকোপ থেকে লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পূর্বমীমাংসকবাদি আচার্য্যগণ

এবং ভট্টপাদ ও তাঁর যোগ্য শিষ্যেরা। পূর্বমীমাংসার প্রবর্তক ছিলেন মহর্ষি জৈমিনি। উত্তরমীমাংসার প্রবর্তক ছিলেন স্বয়ং ব্যাসদেব। পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা, উভয়ের মূলেই বেদ। পূর্ব মীমাংসকগণ বেদের কর্মকাণ্ড ও উত্তর মীমাংসকগণ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অধ্যয়ন করতেন। আচার্য্য শঙ্কর ছিলেন উত্তরমীমাংসার প্রধান প্রচারক। সনাতন ধর্ম অবশ্যই এই ষোড়শ বর্ষীয় সন্ন্যাসীর কাছে চিরঋণী ছিল, আছে ও থাকবে। কিন্তু তারও পূর্বে সনাতন ধর্ম অসংখ্য বার কৃতজ্ঞ স্বয়ং কার্তিকের অংশ, আচার্য্য কুমারিল ভট্টের প্রতি। শঙ্করের আবির্ভাবের আগে ভারতবর্ষ যেভাবে বৌদ্ধদের নিপীড়নের শিকার হয়েছে আচার্য ভট্ট না থাকলে হয়তো সনাতন ধর্ম লুপ্ত হয়ে যেত। বেদবিরোধী বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদীদের বিচারে পরাস্ত করে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন বৈদিক কর্মকাণ্ড। শঙ্করের আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন ভট্টপাদ। বারো শত বৎসর যাবৎ বৌদ্ধ প্লাবনের ফলে বিধ্বস্ত ও হীনবল হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের বীজ বপন করেছিলেন ভট্টপাদ। বৌদ্ধ শ্রমণগণ জনগণকে বেদ বিরোধ ও রাজশক্তি প্রসারলাভের উদ্দেশ্যে বলতেন যে, বেদসকল বিশ্বাসের অযোগ্য। বেদসকল পরস্পর বিরোধী। সুতরাং বেদমার্গ পরিত্যাগ কর। হিন্দুধর্মও বেদমূলক, তাই বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিল হিন্দুদের মানস থেকে। এমন এক কঠিন মুহূর্তে ভট্টপাদ ধর্মবলে বলিয়ান হয়ে গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন হিন্দুদের এক ছত্রে আনয়নের উদ্দেশ্যে, বেদকে ভিত্তি করে। আর্যভূমিতে বৈদিকধর্মের পুনরুত্থানের জন্যই আচার্য ভট্টের দেহধারণ। দক্ষিণ ভারতীয় চোলদেশে একনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন বেদানুরাগী। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। ধর্মকীর্তি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধাচার্য ধর্মপালের নিকট বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে চোল দেশে এসে খুল্লতাত কুমারিলকে বিচারে আহ্বান করেন। যে-কোনও মত খণ্ডন করতে হলে সেই মত সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। ভট্টপাদ আদ্যপান্ত বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞানলাভের অভিপ্রায়ে রাজী হলেন তর্কযুদ্ধে। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন যে তিনি সেই তর্কে পরাজিত হবেন এবং সেই সঙ্গে এও জানতেন যে, এই পরাজয়ই তাঁকে বৌদ্ধ দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জনের পথ সুগম করে দেবে। হলোও তাই। বিচারে পরাস্ত হয়ে পণ অনুসারে কুমারিলকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হলো। ক্রমশ তিনি নালন্দা বৌদ্ধবিহারে এসে ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যদিও তিনি বাধ্য হয়ে বৌদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু বৈদিকধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অক্ষুণ্ণ। ভট্টপাদের মেধা ও কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল তাঁর বৌদ্ধ বিহারের অনেকটা কাল। ধর্মপালের নিকট শিক্ষালাভে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠলেন বৌদ্ধ দর্শনে ও তাঁর নিগুঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যায়। ভট্টপাদের বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা সমাপনে তিনি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কুমারিলের অজান্তেই সুযোগ এসে উপস্থিত হলো দৈব ইচ্ছায়। একদিন বৌদ্ধাচার্য ধর্মপাল কুমারিল সমেত অন্যান্য শিষ্যদের সামনে বেদের নিন্দা করেন। এতে কুমারিল বিশেষ ব্যাথিত হয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। পার্শ্বস্থ বৌদ্ধভিক্ষুকগণ তা লক্ষ্য করে কুমারিলকে তাঁর ক্রন্দনের কারণ জানতে চান। তিনি বলেন যে বেদের নিন্দা তাঁর মর্মস্থলে বেদনা দিচ্ছে। বৌদ্ধভিক্ষুকগণ ধর্মপালকে এই বিষয় জানাতেই তিনি কুমারিলকে প্রশ্ন করলেন, ''তুমি কাঁদছ কেন? তাহলে তো দেখছি তুমি এখনো বেদ বিশ্বাসী হিন্দু। বৌদ্ধশ্রমণ সেজে প্রতারণা করেছ আমাদের''। কুমারিল বিনীত ভাবে বললেন যে আপনি অকারণে বেদের নিন্দা করছেন। এই শুনে উত্তেজিত ধর্মপাল বলে উঠলেন, ''তাহলে তুমি আমার কথার অযথার্থ প্রমাণ কর''। তখন বৌদ্ধাচার্য ধর্মপাল ও কুমারিল ভট্টের মধ্যে বিচার আরম্ভ হলো। কুমারিল ভট্টও কঠিন তর্কজালে জর্জরিত করলেন ধর্মপালকে। সঙ্গে এও বললেন যে, বুদ্ধ বৈদিক ধর্মমার্গ অনুসরণ করে বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বেদকে অস্বীকার করেছেন। একে চৌর্যবৃত্তি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? কুমারিলের কঠোর মন্তব্য শুনে ধর্মপাল ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন কুমারিলকে নালন্দার ছাদ থেকে ফেলে দিতে। আদেশ পালন হলো সঙ্গে সঙ্গে। কুমারিল যোগস্থ হয়ে বলেছিলেন, ''বেদ যদি সত্য হয় তো আমার যেন জীবনরক্ষা হয়''। উঁচু ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার পর কুমারিলের মৃত্যু হলো না দেখে ভিক্ষুগণ বিস্মিত হলো (মতান্তরে অনেকেও এও বলেন যে সেই ঘটনায় কুমারিলের একটি চোখ কেবল নষ্ট হয় কারণ তিনি বেদের সত্তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি বেদ সত্য হয়!)। এদিকে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বহুভাবে সম্মানিত করে ও মহা সমারোহে কুমারিলকে নিয়ে গেলেন নালন্দার বাইরে। ওই ঘটনাকে অবলম্বন করে এক মারাত্মক বিরোধ সৃষ্টি হলো তৎকালীন বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে। এরপর হিন্দুগণ কুমারিলকে পুরোবর্তী করে আয়োজন করলেন এক বিচারসভার। বিবাদী পক্ষে আচার্য ধর্মপাল। বিচারের পণ স্থির হলো— বিজেতার ধর্মমত গ্রহণ অথবা তুষানলে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ। কুমারিলের প্রতিভার কাছে ধর্মপাল পরাজিত হলেন। কিন্তু ধর্মান্তরিত হতে তিনি রাজি হলেন না। সত্য পালন করে তিনি তুষানলে প্রবেশ করলেন। এই ঘটনার পর ভারতের সর্বত্রই একছত্র অধিকার হতে লাগল কুমারিল ভট্টের। তিনি সেই সময়ে সর্বত্র বিজয়ী হয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করলেন। বৌদ্ধাচার্য ধর্মপালের পরাজয়ের পর কেউ আর সাহস করত না কুমারিলের সম্মুখীন হওয়ার। ভট্টপাদ পূর্ব মীমাংসক ছিলেন। তিনি মীমাংসা-শাস্ত্রের শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক, টুপটীকা, মানবধর্ম- সূত্রভাষ্য আদি গ্রন্থের রচনা করেছিলেন। তাঁর 'তন্ত্রবার্তিক' গ্রন্থে সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ভারতের সর্বত্র বেদের সততা ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন করে বৈদিক ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। বৈদিক

ভারতে একছত্র আধিপত্য সত্ত্বেও তাঁর মন সর্বদাই ব্যাথিত থাকত গুরুহত্যার দায়। তাঁর বৌদ্ধ গুরুর আত্মত্যাগকে স্মরণ করে গ্লানি ও বিষাদে ভরে যেত ভট্টপাদের মন। সর্বশাস্ত্রে পারংগত ভট্টপাদ তাই শাস্ত্রানুসারে নিজেই অপরাধের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বেছে নিলেন তুষানলে প্রবেশের পথ।

ঠিক এমন সময়ে প্রয়াগে এসে উপনীত হলেন ষোড়শ বর্ষীয় সন্ন্যাসী শঙ্কর, কুমারিলের সঙ্গে বিচারেচ্ছু হয়ে। স্থানের আধ্যাত্মিক ভাবধারা তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে তিনি অভিভূত হলেন। সশিষ্য তিনি বৃক্ষমূলে উপবিশন করেছেন কী এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন যে ভট্টপাদ গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করেছেন। ওই সংবাদ শ্রবণে তিনি চললেন জনতা লক্ষ্য করে।

দূর হতেই দেখা গেল পর্বতপ্রমাণ তুষস্তূপ। আচার্য্য যতক্ষণে ভট্টপাদের নিকট পৌঁছলেন ততক্ষণে তুষে অগ্নিসংযোগ করা হয়ে গেছে। দূর হতেই আচার্য ও ভট্টপাদ অভিবাদন বিনিময় করলেন। আচার্যের নাম ও অদ্ভুত কীর্তি আগেই শ্রবণ করেছিলেন ভট্টপাদ। তাই প্রয়াণের আগে শঙ্করকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মতিমান, আমি জন্মান্তরে বহু পুণ্য অর্জন করেছিলাম তাই এই জন্মে অন্তিম সময়ে আপনার দর্শনলাভে ধন্য হলাম। আমি কর্মমার্গ নির্ণয় করেছি কিন্তু কালকে অতিক্রম করতে পারিনি। যখন বৌদ্ধদের প্রকোপে বেদোক্ত ধর্মাচার বিলুপ্ত হতে চলেছিল তখন আমি তাঁদের পরাজিত করে পুনঃ বেদের কর্মকাণ্ডের স্থাপনা করেছি। আমি জীবনে দুটি মহৎ অপরাধ করেছি; প্রথমটি হলো বৌদ্ধ গুরুকে পরাজিত করে তাঁর প্রাণ নাশ; দ্বিতীয় জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে একনিষ্ঠ চিত্তে 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' এরূপ প্রমাণ। এই দুই মহৎ দোষের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি তুষানলে প্রবেশ করলাম। এখন বলুন কী অভিপ্রায় আপনার আগমন'? ক্ষণকাল মৌন থেকে শঙ্কর উত্তর দিলেন, 'হে পণ্ডিতবর, আমি আপনার কাছে এসেছি বেদব্যাস আদিষ্ট হয়ে। আমি অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছি। আপনি ওই মত গ্রহণ করে আমার ভাষ্যের বার্তিক রচনা করুন। আমি এখুনি কমণ্ডলের জল দ্বারা তুষাগ্নি নির্বাপিত করছি'।
ব্রাহ্মণ-গৌরব ভট্টপাদ বলতে লাগলেন, 'হে যতিবর, আমি বেদোক্ত যে ব্রতে ব্রতী হয়েছি তা ত্যাগ করলে সুধীগণ আমার নিন্দা করবে। লোকাচার বিরুদ্ধে কর্ম আমি কখনো করব না। আমি জানি আপনার প্রভাবের কথা। তবু বলছি, আপনি আমার দ্বারা যে কার্য করাতে ইচ্ছা করছেন, তা আমার শিষ্য মণ্ডণ মিশ্র দ্বারা করাতে পারেন। তাঁর পরাজয় আর আমার পরাজয় সমান। বিচারে মণ্ডণ আমার অপেক্ষা কোনও অংশে কম না। ওঁকে বিচারে পরাজিত করলেই আপনার সমস্ত জগত জয় করা হবে। হে মহাত্মন, আমি আর অন্য চিন্তা করব না। চিত্ত সমাহিত করব পরব্রহ্মে। আপনার সমক্ষেই এই দেহ ত্যাগ করব'। ততক্ষণে তুষানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। একটি মহাপ্রাণ মহাপুরুষ সনাতন বৈদিক ধর্মের বেদিমূলে আত্মোৎসর্গ করছেন। ভট্টপাদের এই মর্মস্পর্শী বাণী শুনে শঙ্কর ক্ষণকাল মৌন হয়ে গম্ভীরস্বরে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। অগ্নি গ্রাস করল ভট্টপাদের দেহকে। কুমারিলের আত্মা প্রয়াণ করলেন অমরধামে। অস্ত গেল বৈদিক ধর্মের পূর্ব মীমাংসার সূর্য ও উদয় হলো উত্তর মীমাংসার পূর্ণচন্দ্রের।

আচার্য্য কুমারিল ভট্টের গুরুভক্তি, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ সনাতন ধর্মের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সনাতন ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভট্টপাদ বিচার করেছিলেন যে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মকে বিচারে পরাস্ত করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আর সেই কার্য সম্পাদিত করতে হবে তাঁদের থেকে শিক্ষা লাভ করেই। কোনও মতকে পরাজিত করতে গেলে সেই মতের আদ্যপান্ত জানা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যেই ভট্টপাদ এসেছিলেন বৌদ্ধ বিহারে। এবং উদ্দেশ্যে সফলও হন। বৌদ্ধ ধর্মের আদ্যপান্ত অধ্যয়ন করেন ভট্টপাদ। এখানে দ্রষ্টব্য যে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও তিনি ভোলেননি সনাতন ধর্মের কথা। বেদ নিন্দা শ্রবণ মাত্রই তিনি অশ্রু বিসর্জন করতেন সবার অলক্ষ্যে। ক্রমে বৌদ্ধ শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে ভট্টপাদ নিজ গুরুকে বিচারে পরাস্ত করে আবার বৈদিক ধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু ভট্টপাদ তবুও ভোলেননি তাঁর বৌদ্ধ গুরুর আত্মত্যাগ। গুরুর সাফল্য তাঁর শিষ্যের কাছে পরাজয় স্বীকারে। কিন্তু তাঁর গুরু ধর্মপালের আত্মত্যাগ তাঁকে গ্লানি ও প্রায়শ্চিত্তের বাণে জর্জরিত করছিল সর্বক্ষণ। সনাতন ধর্মের বৈদিক কর্মকাণ্ড পুনর্স্থাপনের পরই তিনি সেই বেদকেই অবলম্বন করেই বেছে নিয়েছিলেন গুরু হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তুষানল প্রবেশ স্বরূপ। সে সময়ে এমন দিগ্‌বিজয়ী, নিরভিমানী ও আত্মত্যাগী পণ্ডিত সুদুর্লভ। কেবল মাত্র ধর্ম রক্ষার্থে প্রাণ ধারণের এক জলন্ত নিদর্শন কুমারিল ভট্ট।

শঙ্করের এর পরের মণ্ডণ বিজয় ও শেষ জীবনের কাহিনি সকলের সুপরিচিত। যদিও ভট্টপাদ ছিলেন পূর্ব মীমাংসক এবং শঙ্কর ছিলেন উত্তর মীমাংসক, তবুও কাল ও সময় উপযুক্ত বেদের ব্যাখ্যাকে কোনওমতেই নাকচ করা যায় না। যে সময় ভট্টপাদ এসেছিলেন সেই সময়ে সাধারণ মানুষ বেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারাই মহৎ বস্তু লাভের চেষ্টা করত। এবং তাঁদের মানসিকতাও সেই রূপ ছিল। যুগ পরিবর্তনে এলেন শঙ্কর, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কাণ্ডারি হয়ে। সেই সময় মানুষ কর্মে ব্যস্ত হয়ে মূল বস্তুকেই ভুলতে বসেছিল সম্প্রদায় আসক্ত হয়ে। শঙ্কর ও ভট্টপাদের স্ব-স্ব মতের ভিন্নতা হলেও তা বেদোক্ত ছিল এবং প্রয়োজন ছিল যুগের চাহিদার। ভট্টপাদ তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাখার দ্বারাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বৈদিক ধর্মকে শঙ্কর আসা পর্যন্ত। তাঁর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মের উদারতা ও মহানতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন ভট্টপাদ। আর আচার্য শঙ্করের বত্রিশ বর্ষীয় জীবনের শেষ শোড়ষ বর্ষের জীবনযুদ্ধকে ভট্টপাদের ত্যাগ ও আদর্শই দীপশিখার ন্যায় আলোকিত করে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার দিকে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

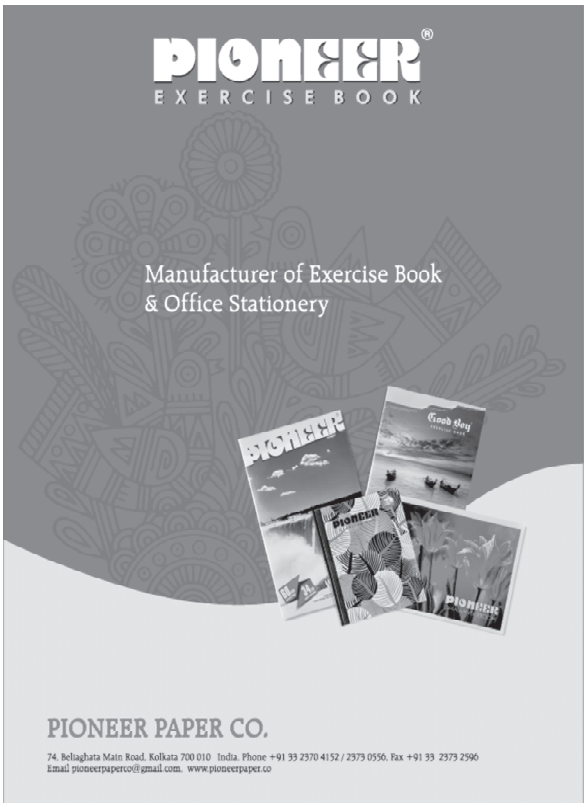

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

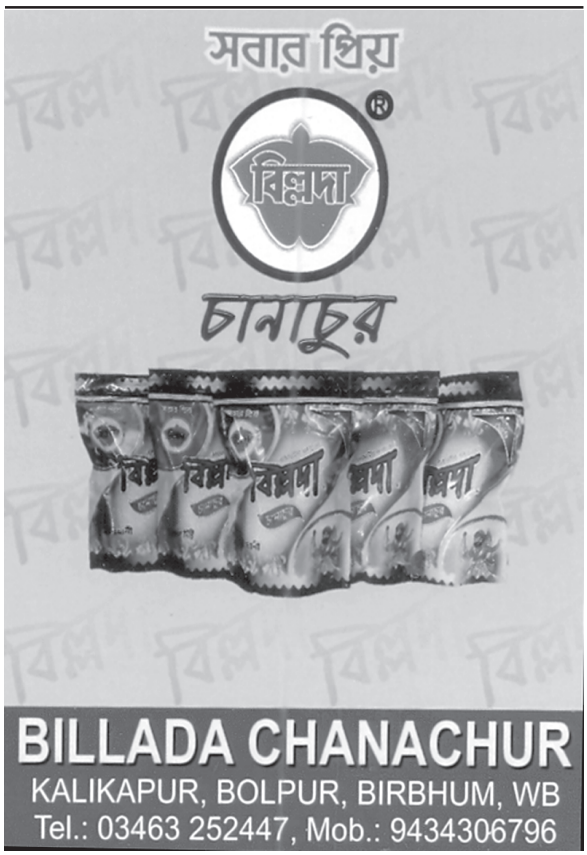

সুযোগ

মানসী রায়

ভোর চারটের কিছু আগে ঘুম ভেঙে গেল অজন্তার। আজকাল প্রায়ই এরকম হচ্ছে। সারাদিন এমনিতেই ঘুম হয় না, রাতে ঘরের সব কাজ সেরে, গুছিয়ে শুতে শুতে প্রায় বারোটা বেজে যায়। তা সত্ত্বেও চোখের দুই পাতা শেষ রাতে সেই যে খুলে যায় আর কোনওভাবেই এক হতে চায় না। সেই সঙ্গে বুক ঢিপঢিপ। লাগোয়া ঘরে ছেলে। আর দেড় মাসও নেই তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার। ভোর ভোর ছেলে উঠে পড়ে বলেই কি তার ভেতরেও এক অদৃশ্য অ্যালার্ম ঘড়ি কাজ করে? বুঝতে পারে না অজন্তা। ইদানীং তার খুব অস্থির অস্থির লাগে! ছেলে সারাদিন বাড়িতে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কোনও কথা বলে না। চোখে অদ্ভুত এক অন্যমনস্কতা। এটা কেবল বেশি পড়াশোনার জন্যই বলে মনে হয় না অজন্তার। অবশ্য ছেলে কবেই বা তার সঙ্গে যেচে ভালো করে কথা বলেছে! দশ বছর আগে প্রতীক যখন তাকে বিয়ে করে নিয়ে এল, তখন সন্তু মাত্র পাঁচ বছরের। ওই বয়সে শিশুরা মা-বাবাকে ভালোই চিনে যায়। সন্তুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'তুমি আমার মা নও'— এই কথাটা যে আজ পর্যন্ত অজন্তা কতবার শুনেছে, তার হিসেব করলে পাহাড় তৈরি হয়ে যাবে। অথচ প্রতীক চেয়েছিল অজন্তা তার স্ত্রী নয়, সন্তুর মা হিসেবে এ বাড়িতে আসুক!

কপালই হবে, নইলে বি.এ পড়ার সময় কেন জানা যাবে অজন্তার ডিম্বাশয়ে গড়ে উঠেছে বড় বড় ক্ষতিকর টিউমার এবং সেজন্য তার ডিম্বাশয় দুটো কেটে বাদ না দিলেই নয়! তার মানে কী দাঁড়ালো? অজন্তা আর কোনওদিনই নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারবে না এবং ফলস্বরূপ, জেনেশুনে কেউ তাকে বিয়ে করতেও রাজি হবে না। তাই অপারেশনের পরে তার মা বাবার প্রতিটা দিন চোখের জল ফেলেই

কাটছিল যতদিন না পাড়ার বুড়োকাকা প্রতীকের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা আনল। বহুজাতিক সংস্থায় বিশাল চাকরি করা, দারুণ ব্যস্ত, বিপত্নীক পুরুষ। বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে। মা বাবা নেই। আত্মীয়-স্বজনও ধারে কাছে বড় একটা কেউ থাকে না। এমন মেয়ে চাই যে ঘরকন্যা করবে ও শিশুটির মা হয়ে উঠবে। অজন্তার মা বাবা সম্বন্ধটা পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেল! প্রতীকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এতটুকু কালবিলম্ব করেনি। এরপর একদিন প্রতীক তাদের বাড়িতে এল অফিসের এক বন্ধু আর বুড়োকাকাকে নিয়ে। অজন্তা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, এম.এ পড়ছে তখন, মধ্যবিত্ত পরিবার। এই ধরনের পরিবারে যা হয়, মেয়ের জন্মের পর থেকেই বাবা মা তার বিয়ের কথা ভেবে একটু একটু করে টাকা পয়সা জমাতে শুরু করে। কাজেই পণের দাবি মেটানোর অল্পস্বল্প ক্ষমতা অজন্তার বাবা রাখত। সেসব নিয়ে অসুবিধের কিছু ছিল না। যেটা ছিল, সেটা শুনে প্রতীক বরং খুশিই হলো। সে ছেলে-অন্তপ্রাণ! অথচ সংসারে, ছেলেকে সময় দিতে পারে না। অজন্তা যেন সেই অভাব পূরণ করে দেয়— এটুকুই তার দাবি। অজন্তার মা বাবা তাদের খুঁতো মেয়ের জন্য এতটা ভালো পাত্র বা ঘর পাবে আশা করেনি। তাই এম.এ পার্ট টু-র পরীক্ষাটা শেষ হতেই যা দেরি! অবশ্য ঘটাপটা কিছু হয়নি তাদের বিয়েতে। নিতান্তই সাদামাটা রেজিস্ট্রি বিয়ে, কারণ পাঁচ বছরের ছেলে কোলে নিয়ে মাথায় টোপর দিয়ে বিয়েতে বসা যায় না! অজন্তার বাবা মায়ের একটু লোকজন ডেকে সামান্য রীতি-রেওয়াজ বা খাওয়ানোর মতো লৌকিকতা করার ইচ্ছে ছিল। হাজার হোক, তাদের একমাত্র মেয়ের প্রথম বিয়ে— প্রতীক কিছুতেই রাজি হয়নি। অতএব রেজিস্ট্রির পরদিন থেকেই অজন্তার ঠিকানা হলো এক বহুতলের মস্ত ফ্ল্যাটে ছোট্ট সন্তুর ঘরে। প্রতীকের অন্য ঘর। পরে অবশ্য খুব কাছের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, বস ও নিকটাত্মীয়দের ফ্ল্যাটে ডেকেছিল প্রতীক। কী আশ্চর্য, সেখানে সবার কাছে সে অজন্তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সন্তুর মা বলে! খুব অবাক আর আহত হয়েছিল অজন্তা। প্রতীকের কাছে এ ব্যাপারে অনুযোগ করেও লাভ হয়নি। তারপর যা হয়— আস্তে আস্তে ভবিতব্যকে মেনে নিল। মেয়েদের মেনে নেওয়া ছাড়া আর কীই বা করার থাকে! সুটকেসে বয়ে আনা চাকরির পরীক্ষার বইগুলো অবহেলায় ফেলে রেখে একটা মাতৃহীন, অবাধ্য, একগুঁয়ে ছেলেকে কাছে টানার চেষ্টা করতে লাগল। দিন নেই রাত নেই ছেলের পেছনে পড়ে থেকেছে অজন্তা। তার পড়াশোনা, খাওয়া, স্নান, ঘুম, খেলা সবই দায়িত্ব নিয়ে দেখাশোনা করেছে। এতটা তার গর্ভধারিণীও করত কি না সন্দেহ! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে। সন্তু অজন্তাকে মা হিসেবে না হলেও পরিবারের একজন বলে মেনে নিয়েছে অথবা মেনে নেওয়ার ভান করেছে। আগের মতো দুরছাই যেমন করে না, গলাগলিও করতে আসে না। মোদ্দা ব্যাপার হলো, সন্তুর কাছে অজন্তা টেকেন ফর গ্রান্টেড। সন্তুর দেখভালের জন্যই অজন্তা এ বাড়িতে আছে, তার আর কোথাও কোনও ভূমিকা নেই, থাকতে পারে না, ব্যাস!

প্রতীক এত তলিয়ে ভাবে না। সে বাইরেটা দেখেই খুশি এবং সন্তুষ্ট। তবে এখন তারও বয়স হচ্ছে। থেকে থেকেই একটা ভরসার জায়গা আর সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করছে। তা এমন মানুষ অজন্তা ছাড়া কে-ই বা হতে পারে! কিন্তু যতবার তারা দুজন নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে চেয়েছে, সন্তুর আচার, আচরণ, মেজাজ পালটে গেছে। সেজন্য বাধ্য হয়েই প্রতীক আবারও তার আগের অবস্থান অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ধীরে ধীরে মা হয়ে উঠলেও অজন্তার স্ত্রী হয়ে ওঠা আর হয় না!

কিন্তু যতই যাই হোক, পরীক্ষার ক'মাস আগে সন্তুর এভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হয় অজন্তার। বাইরে যায় না। বন্ধুদের সঙ্গে মেশে না। আজকাল অবশ্য মেশামিশির জন্য বেরোনোর দরকারও হয় না। মোবাইলের স্ক্রিনে আঙুল ছোঁয়ালেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়! কিছু খোঁজখবর অজন্তাও রাখে বই কি! রান্না শিখতে হোক বা ছেলের স্কুলের বন্ধুবান্ধবের মায়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য হোক, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহারে সে ভালোই স্বচ্ছন্দ। উপরন্তু, যখনই সময় পায় খবরের কাগজ নয়তো টিভির খবর গোগ্রাসে গেলে। এই খবর থেকেই অজন্তা মারণ নীল তিমি বা ব্লু হোয়েলের কথা জানতে পেরেছিল। অনলাইনে স্রেফ একটি খেলার মধ্যে দিয়ে কীভাবে অপরিণত, বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানো ছেলে-মেয়েগুলোকে নীল তিমির মতো আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাইরের একটি দেশের কিছু অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। এই খেলায় মোট ৫০টি কাজ বা চ্যালেঞ্জ ৫০ দিনে প্রমাণসহ সম্পন্ন করতে হয়। কী কী করতে হবে তা এই গেম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও প্রতিনিধি বা কিউরেটরের মাধ্যমে খেলোয়াড়কে জানিয়ে দেওয়া হয়। হাত-পা ব্লেড দিয়ে কেটে কোনও কোড লেখা, ভোর চারটে কুড়িতে উঠে ছাদের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা, সকলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, প্রচণ্ড ভয়ের কোনও ছবি দেখা— এগুলো হচ্ছে খেলার এক একটা ধাপ। এভাবেই একদম শেষে খেলার অন্তিম চ্যালেঞ্জ হিসেবে কোনও উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে খেলোয়াড়কে আত্মহত্যা করতে বলা হয়। শুধুমাত্র বিদেশেই নয়, এদেশেও বহু বহু কোটি টাকার জুয়াখেলা চলছে এই নীল তিমিতে ভর করে। ছেলে-মেয়েগুলো কেউ কেউ চূড়ান্ত অবসাদের শিকার হয়ে বা অত্যধিক সাহস দেখিয়ে, অন্যথায় নিছক খেলার মোহেই এই খেলায় জড়িয়ে পড়ছে।

তাই সন্তুর আচরণের পরিবর্তনে স্বাভাবিক ভাবেই অজন্তার নীল তিমির কথা মনে এসেছিল। কথাটা সে প্রতীককেও জানায়। কিন্তু প্রতীকের দৃঢ়

বিশ্বাস ছেলে অবশেষে পড়াশোনায় মন দিয়েছে। যার সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার খাঁড়া ঝুলছে সে ঘরে বসে থাকবে না তো কি পার্কে গিয়ে ফুটবল খেলবে? কম্পিটিশনের যুগ, ঘাড় গুঁজে দিন রাত এক না করে দিলে ভবিষ্যতে কপালে দুঃখ আছে। তা ছাড়া সন্তু অবসাদগ্রস্ত হতে যাবেই বা কেন— আদরযত্ন, মনোযোগ, কোনটা কম পড়ছে তার ইত্যাদি ইত্যাদি। অজন্তা মনে মনে হাসে। মানুষের চাওয়া-পাওয়া যদি এইরকম সরলরেখায় চলত! তার মায়ের মন বলছে খারাপ কিছুই ঘটছে। হতে পারে সে সন্তুকে পেটে ধরেনি, কিন্তু ওইটুকু বয়স থেকে বড় তো করেছে! সে জানে অত ভোরে উঠে সন্তু ছাদে যায় চুপি চুপি। কিছুক্ষণ পরে আবার তেমনি পা টিপে টিপে ঘরে চলে আসে। সারাদিন কাজের পর ক্লান্ত প্রতীক তার নিজের ঘরে মড়ার মতো ঘুমোয়। তাকে ওই সময় ডেকে তুলে দেখাতে মায়া লাগে অজন্তার। সে নিজে কোনও প্রশ্ন করলে সন্তু হয় অন্য কিছু বলে এড়িয়ে যায়, নয় তো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। নিরুপায় হয়ে অজন্তা সন্তুর বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ওর বাথরুমে যাওয়ার সময়টুকুর জন্য ওঁত পেতে থাকে। ঘরে ঢুকে শ্যেন দৃষ্টিতে খোঁজে ব্লেড, রক্তের ফোঁটা। তেমন কিছু চোখে পড়ে না। বোকা ছেলে তো নয়! সন্তুর মোবাইলটা খুলে দেখা দরকার ছিল, কিন্তু সেটা তার নিজস্ব নকশায় লক করা। অজন্তার পক্ষে খোলা অসম্ভব। নিজের ফোনে যখনই সন্তুকে অনলাইনে দেখে, তার বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে! দিন পেরিয়ে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অজন্তা

উঠে পড়ে। লাগোয়া ঘরে খুটখুট আওয়াজে টের পায় সন্তুও উঠে পড়েছে। চারটে কুড়ি বাজতে আর বেশি দেরি নেই। ছেলে ফ্ল্যাট থেকে বেরোতেই অজন্তা দরজায় এসে দাঁড়ায়। তারপর সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে নেমে আসা লিফটে চড়ে সোজা ছাদ। গিয়ে দেখে বিশাল ছাদের এক কোণে রেলিং টপকে সন্তু দাঁড়িয়ে আছে। দুই হাত লম্বা করে দুদিকে ছড়ানো। আবছা ভোরের আলোয় লাফ দেওয়ার আগের মুহূর্তে মরণোন্মুখ এক নীল তিমি! যাকে গত ঊনপঞ্চাশ দিন ধরে তার কিউরেটর একটার পর একটা মর্মকামী কাজ দিয়ে গেছে। অজন্তা ভাবল ছুটে গিয়ে তাকে ধরে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এই তার সুযোগ! আর একটু পরেই তার এতগুলো বছর ধরে চাপিয়ে দেওয়া মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ের পালা শেষ হয়ে যাবে। বাকি জীবনটুকুতে নিষ্কণ্টক ভাবে স্বামীকে পাওয়ার এটাই তো সহজতম উপায়! যে পথ নেওয়ার কথা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সেই পথ কেমন নিজে থেকে তার সামনে খুলে যাচ্ছে! অন্তত এবার যদি তার স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃতি পায়!... সন্তুর শরীরটা বাইরের দিকে একটু ঝুঁকল কি?

কিন্তু না। সন্তুকে বাঁচাতেই হবে। এগিয়ে যায় অজন্তা। আফটার আল, সে তো মা। ■

কৃষ্ণসখা

ভগবান কৃষ্ণ মানুষ হয়েছে নন্দরাজের ঘরে। ছোটবেলায় তার ডাকনাম ছিল কানাই। বন্ধুদের সঙ্গে সে সারাদিন খেলে বেড়াত। জঙ্গলের ধারে মাঠে যেত গোরু চরাতে। তাঁর অনেক বন্ধুর মধ্যে একজন ছিল সুদাম। খুব গরিব তারা। কিন্তু বন্ধুত্বের কোনও খামতি ছিল না।

অনেক বছর পর যখন তারা বড় হলো তখন কৃষ্ণ হলো মথুরার রাজা। কিন্তু তাঁর বন্ধু সুদাম আগের মতোই গরিব। সুদামের স্ত্রী একদিন বলল— ওগো, তোমার বন্ধু তো মথুরায় রাজা, তাকে বলে একবার সংসারটাকে ভালো করো। আর কতদিন এরকম গরিব থাকবে?

সুদাম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল— কানাই আমার ছোট্টবেলার বন্ধু, একসঙ্গে কত খেলাধূলা করেছি, ননী চুরি করে খেয়েছি। এখন সে রাজা, আমার খুব গর্ব হয়। তাই বলে প্রাণের বন্ধুর কাছে নিজের স্বার্থের কথা বলব। তা কী করে হয়?

সুদামের স্ত্রী বলল— সে না হয় নাই বললে, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে তো একবার দেখা করে আসতে পার।

সুদামের মুখে হাসি ফুটলো, কতদিন সে কানাইকে দেখেনি। রাজা হওয়ার পর তো সে এদিকে আসার ফুরসতই পায়নি। বড় ইচ্ছে করে রাজবেশে বন্ধু কানাইকে দেখতে। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখায় তাকে!

স্ত্রীকে সে বলল— তুমি ঠিকই বলেছ। কানাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। কতদিন দেখিনি। তুমি বরং ওর প্রিয় কিছু খাবার বানিয়ে দাও। বড় খুশি হবে সে।

গরিবের ঘরে কী আর থাকবে, একহাঁড়ি ননী আর চালভাজা পুটুলিতে বেঁধে দিয়ে স্ত্রী বলল— তোমার বন্ধুকে বলবে এই ননী আর চালভাজা আমি নিজে হাতে করে দিয়েছি।

ননী আর চালভাজা নিয়ে সুদাম খুশি মনে চলল রাজদর্শনে। তিনদিন পায়ে হেঁটে অবশেষে সে পৌঁছালো মথুরা নগরীতে। ধুলো-ধুসরিত অঙ্গ, অবসন্ন শরীর। দেখলো রাজদুয়ারে বল্লম হাতে সেপাই পাহারা দিচ্ছে। সুদামের মলিন বেশভূষা দেখে সেপাই তাকে ভেতরে ঢুকতেই দিল না। সুদাম কাতর স্বরে বলল— কানাই আমার বন্ধু, আমরা একসঙ্গে কত খেলেছি।

সেপাই শুনলো না তার কথা। সুদাম মনে বড় দুঃখ পেল। ননী আর চালভাজার পুটুলি হাতে সে রাজবাড়ির কাছে এক গাছতলায় বসে রইলো।

এদিকে রাজবাড়ির ভেতর কৃষ্ণ উদ্বেল হয়ে পড়েছে। মন্ত্রীকে ডেকে সে বলল— মন্ত্রীমশাই আপনি দেখুন রাজদুয়ারে আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভিতরে নিয়ে আসুন।

মন্ত্রী জানে কৃষ্ণ অন্তর্যামী। না দেখেও সে বুঝতে পারে। মন্ত্রী ছুটলো রাজদুয়ারের দিকে। রাজদুয়ারের সেপাইকে জিজ্ঞেস করলো— রাজার কোনও বন্ধু এসেছে?

সেপাই বলল— না! তবে মলিন বেশে এক গরিব মানুষ এসেছিল, আমি তাকে ঢুকতে দেইনি। ওই গাছতলায় সে বসে আছে।

বুদ্ধিমান মন্ত্রীর বুঝতে বাকি রইলো না। তিনি ছুটলেন গাছতলার দিকে। গিয়ে সুদামকে অভ্যর্থনা করে রাজপ্রাসাদের ভিতরে নিয়ে এলেন। কুণ্ঠিত সুদাম ভয়ে ভয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলো। আগে কখনো সে রাজবাড়ি দেখেনি। কত বড় বড় থাম, কত মূল্যবান রত্ন দিয়ে সাজানো। অবাক হয়ে গেল, তার বন্ধু কানাই এতবড় বাড়িতে থাকে!

সুদামাকে দেখামাত্র কৃষ্ণ দৌড়ে সিংহাসন থেকে নেমে এলো। জড়িয়ে ধরলো সুদামকে। তারপর নিজে হাতে জল দিয়ে পা ধুইয়ে দিল। স্ত্রী রুক্মিণীকে বলল— আমার বন্ধু ক্লান্ত, তুমি ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

বাল্যবন্ধুকে দেখে সুদাম কাঁদতে লাগলো। সঙ্কোচে পুটুলির চালভাজাও আর বার করলো না সে। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে পাশে বসিয়ে কানে কানে বলল— বাড়ি থেকে যে চালভাজা আর ননী এনেছ তা বুঝি আমাকে দেবে না। শিগগির বের কর ওইসব।

তারপর বন্ধুর আদর আপ্যায়নে মথুরায় কয়েকদিন কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরলো সুদাম। কিন্তু বাড়ির অদূরে এসে দেখে তার কুঁড়েঘরটি নেই। অবাক হয়ে গেল, কোথায় গেল আমার কুঁড়ে! আর এই অট্টালিকাই বা কে বানালো। অট্টালিকার ভিতর থেকে স্ত্রী দৌড়ে বেরিয়ে এলো, বলল— তুমি চলে যাওয়ার পর কোথা থেকে সব রাজমিস্ত্রীর দল এসে বলল, রাজার আদেশে এখানে কুঁড়েঘরে থাকা চলবে না। তারা দিনরাত কাজ করে এই অট্টালিকা বানালো। স্ত্রীর কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সুদাম।

(প্রচলিত)

ভারতের পথে পথে

দেবী চৌধুরাণীর মন্দির

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস। সেই উপন্যাসের দস্যুরাণী মিথ হয়ে আজও বেঁচে আছে জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরাণী কালী মন্দিরে। মা কালীর পাশাপাশি সেখানে পূজিত হন ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী। স্থানীয় লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি অনুসারে এক সময় নদী পথে এই মন্দিরে নিয়মিত আসতেন দেবী চৌধুরাণী। পূজা দিতেন সেখানে। শতবর্ষ প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় এই মন্দির আজও যেন কেমন রহস্যময়তায় ঘেরা। ঐতিহাসিকভাবে সন্ন্যাসী, ফকির বিদ্রোহের সময়ের সাক্ষ্য বহন করে আসছে এই মন্দির।

জানো কি?

- নীললোহিত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।
- বনফুল সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।
- মৌমাছি কবি বিমল ঘোষের ছদ্মনাম।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর মন্দির গল্পের জন্য কুন্তলীন সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন।
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

ভালো কথা

হনুমানের সাজ

কদিন আগে রামনবমী হয়ে গেল। সেই উপলক্ষ্যে আমাদের এখানে একটি শোভাযাত্রা হয়েছে। শোভাযাত্রার তিন দিন আগে দাদারা বলল, হনুমান সাজতে হবে আমাকে। মাকে বলতে, মা বলল আমি তোকে সাজিয়ে দেব হনুমান। সেইমত রামনবমীর আগের দিন আমার জন্য ড্রেস আনা হলো, লেজ তৈরি করা হলো। সেদিন দুপুর থেকে শুরু হলো আমার সাজ। মাথায় মুকুট, মুখে লাল রঙ, অলঙ্কার। সমস্যা দেখা দিল লেজ লাগাতে গিয়ে। কিছুতেই কোমরে থাকছে না। অবশেষে সেটাও লাগানো হলো। তারপর বিকেলে বেরোল শোভাযাত্রা। পাড়ার এক দাদা সেজেছিল রাম। আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। রাস্তার দুদিকে লোকজন আমাদের দেখছিল। অনেকে ছবি তুলছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমি হনুমান সাজলে লোকে কী বলবে। কিন্তু পরে দেখলাম সবাই আমাকেই দেখছে। খুব আনন্দ হয়েছিল সেদিন। তবে হাঁটা একটু বেশি হয়েছে। পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল।

সঞ্জু ঘোষ, ষষ্ঠ শ্রেণী, হরিঘোষ লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

চৈত্রের গরম

কৌশিক মিত্র, দশম শ্রেণী, আমতা, হাওড়া

চৈত্রমাসের কাঠফাটা রোদ
বলছে সবাই আর পারি না,
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক
সর্দিকাশির ধার ধারি না।
গলির ক্রিকেট বন্ধ এখন
ফুটবলে পা দিলেই বকা
মরবি নাকি এই গরমে
বাইরে গেলেই লাগবে ছ্যাঁকা।
তার চেয়ে থাক বাড়ির ভেতর
ফ্যানের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে
দেখব সবাই সবাই আই পি এলে
ধোনির ড্রাইভ ছুটছে ঘাসে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

কমনওয়েলথ গেমসে সফল ভারতীয়রা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের গোল্ডকোস্টে ২১তম বিশ্ব কমনওয়েলথ গেমসে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স করেছে ভারতীয় অ্যাথলিটরা। ২০১০ সালে দিল্লির কমনওয়েলথ গেমস থেকে ১০১টি পদক তুলে এনেছিলেন ভারতীয়রা। সেই গেমসকে হিসেবের বাইরে রাখাই সমীচিন। কারণ, নিজের দেশে যে-কোনও বিগ গ্লোবাল ইভেন্টে হোমকান্ট্রি সব সময়েই সুবিধেজনক অবস্থায় থাকে। দর্শক সমর্থন এবং বিচারকদের আনুকূল্য পেয়ে দুর্বল দেশও বড় শক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই দিল্লি গেমসকে বাদ দিলে ২০০২-তে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কমনওয়েলথ গেমসই সর্বোত্তম ছিল ভারতের কাছে। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের পরে উঠে এসেছে ভারত।

বড় শক্তি কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকাকে টেক্কা দিয়ে গেছে ভারতীয়রা অধিকাংশ ইভেন্টে।

কমনওয়েলথ গেমসে চমক দিয়েছে কিশোর প্রজন্ম। শুটিংয়ে অনীস ভানওয়ারে, মানু ভাকের এই গেমসের আবিষ্কার। দুই শুটারই তাদের থেকে অনেক অভিজ্ঞ বিদেশি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুল্যমূল্য লড়াইয়ে পিছনে ফেলে দিয়েছেন যা দেখে অদূর ভবিষ্যতে তাদের নিয়ে আরো বড় সাফল্যের সুখস্বপ্ন দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। অভিজ্ঞ তেজস্বিনী সাওয়ান্ত, হিনা সিধুরাও তাদের ওপর আগত আস্থার প্রতিফলন দিয়েছেন। নেপালী যুবক জিতু রাই ভারতে এসে থেকে যাওয়ার সুফল পাচ্ছেন হাতেনাতে। ব্যাক টু ব্যাক কমনওয়েলথ সোনা উপরি পাওনা নতুন গেমস রেকর্ড স্থাপন। বাংলার কিশোরী মেহুলি ঘোষ ফোকাস নষ্ট করে ফেলায় একটুর জন্য সোনা হারিয়ে বসেন। তার রুপোর পদক ভবিষ্যতে সোনায় বদলে যাবে কাল কারণ তার কোচ মেন্টর যে বিখ্যাত বিদগ্ধ স্যুটার জয়দীপ কর্মকার। শুটিং এবং জীবনের চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়ে মেহুলিকে দিয়ে বিশ্ববৃত্তে সাফল্য করায়ত্ত করাই তার মতো দ্রোণাচার্যের কর্তব্য।

ভারতের ভারোত্তলকরা এই গেমসকে স্বর্ণশোভিত করেছেন। গেমসে প্রথম সোনাটি এনে দিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত মীরাবাই চামু। কয়েকমাস আগে বিশ্বমিট থেকেও খেতাব জিতেছেন। কমনওয়েলথে যে জিতবেন এটা প্রত্যাশিতই ছিল। পুনম যাদব, সতীশ কুমার গর্বিত ও অলংকৃত করেছেন দেশকে। কুস্তির সবচেয়ে বড় মুখ সুশীল কুমার সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন। যাবতীয় বিতর্ক সত্ত্বেও সুশীলের যত বয়স বাড়ছে ততই শানিত হচ্ছেন। ভারতবর্ষে কুস্তির যে ঐতিহ্যময় পরম্পরা তাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে যাচ্ছেন বাহুবলী সুশীল কুমার। তার আদর্শ অনুসরণ করে উঠে আসা বড়বড় জুনিয়ারও অনন্য নজির গড়ে পরপর সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধরাশায়ী করেছেন। বক্সিং থেকেও সবচেয়ে বেশি পদক নিয়ে এসেছেন ফাইটাররা। আফ্রিকার শক্তিশালী লড়াকু প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে গেছেন বিজেন্দারের উত্তরসূরীরা।

কমনওয়েলথ গেমসে সবচেয়ে উজ্জ্বল পদকটি জিতে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত, সাইনা নেওয়ালরা। বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা বহু কীর্তির অধিকারী মালয়েশিয়াকে জমি ধরিয়ে দিয়েছেন তারা। যে দলে আছেন প্রাক্তন বিশ্ব চাম্পিয়ন, অল ইংল্যান্ড চাম্পিয়ন। আগে প্রতিটি গেমসে মালেয়েশিয়ার একাধিপত্য বজায় ছিল। সেই শক্ত গাঁটকে অতিক্রম করতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে গোপীচাঁদের ছেলেমেয়েদের। পিভি সিন্ধুকে ছাড়াই ভারতীয়রা এহেন জবরদস্ত প্রতিপক্ষকে যে হারাবে তা কল্পনার অতীত ছিল। একই কথা বলা চলে টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের সম্পর্কেও। শক্তিশালী নাইজিরিয়া আর সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে দলগত, ব্যক্তিগত বিভাগে যে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন ভারতীয়রা, তা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

তবে যে খেলাটি ভারতকে জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই হকি এবারও হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে দেশবাসীকে। মহিলা ও পুরুষ দল শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে এটাই একমাত্র সান্ত্বনা। শেষ চারের লড়াইয়ে মহিলা ও পুরুষ হকিদল যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে। ফাইনালে না উঠতে পারাটাই চরম ব্যর্থতা।

এই ফল দেখে বোঝাই যাচ্ছে বছরের শেষে ভুবনেশ্বরে বিশ্বকাপ হকিতে কী ফল হতে পারে। খেলমন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোর এবং সাই কয়েকমাসে যা কাজ করেছেন, তার প্রতিফলন দেখা গেল কমনওয়েলথ গেমসে।

রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে সত্যেন দাস।

অন্য রকম

নাকতলা থেকে খারডুং লা

সত্যেন দাসের দুঃসাহসিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমাদের মধ্যে অনেকেই দেশের এক কোণ থেকে আরেক কোণে দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনেছি। এইসব অভিযানকে কেন্দ্র করে অজস্র স্মরণীয় ঘটনা ছবি ভিডিও হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যায়। কেউ অভিযান করেন মোটরবাইকে, গাড়িতে কেউ বা আবার সাইকেলে। কিন্তু কলকাতা থেকে লাদাখ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পথ সাইকেল রিকশয় পাড়ি দেবার কথা চট করে কেউ ভাবেন না।

দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাসিন্দা সত্যেন দাস এই কাণ্ডই ঘটিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর অভিযানের গল্প নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'লাদাখ চলে রিকশওয়ালা' জাতীয় পুরস্কার পাওয়ায় সত্যেন দাস সারাদেশে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

নাকতলার রিকশস্ট্যান্ডে গেলে দেখা মিলবে সত্যেনবাবুর। হয় যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছেন, অথবা যাত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন তার গন্তব্যে। রিকশওয়ালার এই চিরাচরিত রোজনামচায় কীভাবে ঢুকে পড়ল হিমালয়? সত্যেনবাবু বরাবরই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। লাদাখ অভিযানে তিনি যে ধৈর্য এবং সাহস দেখিয়েছেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। শুধু তাই নয়, অভিযানের প্রতিটি খুঁটিনাটি তুলে রেখেছেন তার হ্যান্ডিক্যাম ক্যামেরায়।

এর আগে সত্যেনবাবু একবার রিকশ নিয়ে পুরী গিয়েছিলেন। আর একবার উত্তর ভারতে। তখনই লাদাখ যাওয়ার কথা তার মাথায় আসে। রওনা দেবার কিছুদিন আগে ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর সঙ্গে হঠাৎই তার দেখা হয়ে যায়। ইন্দ্রাণী দুরদর্শনের প্রযোজক। একই পাড়ায় থাকেন। সত্যেনবাবু তাকে লাদাখ যাওয়ার কথা বলেন। পুরনো কিছু অভিযানের ছবি দেখান। ইন্দ্রাণী তখনই সত্যেনবাবুর অভিযানের ওপর একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। ইন্দ্রাণীর কথায়, 'সত্যেনবাবুর পুরো জার্নিটা শ্যুট করার মতো টাকা আমার কাছে ছিল না। তাই, হ্যান্ডিক্যামে কীভাবে ছবি তুলতে হয় আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বেনারস পেরনোর পর ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার টিমের একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে ক্যামেরা মেরামতির ব্যবস্থা করে।'

এত বড়ো অভিযানের খরচ জোগানো সহজ ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল নাকতলা অগ্রণী সঙ্ঘ। সাহায্য করেছেন ইন্দ্রাণী এবং সত্যেনবাবুর নিয়মিত যাত্রীরাও। সত্যেন দাস বলেন, 'আমি একবার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে রিকশ চালিয়ে পুরী গিয়েছিলাম। তারপর একবার উত্তর ভারতে। তখনই আমি খারডুংলা মাউন্টেন পাসে যাব বলে ঠিক করি। লেহ্ থেকে ৩৯ কিলোমিটার দূরে জায়গাটা। এখানেই পৃথিবীর সব থেকে উঁচু মোটরগাড়ি চলাচলের রাস্তা আছে। অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্রাণীদি, আমার প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে দু-একজন এবং নাকতলা অগ্রণী সঙ্ঘের মেম্বাররা।'

নাকতলা থেকে লাদাখ যাত্রায় কী ধরনের অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সত্যেনবাবু জানালেন অসুবিধে মূলত তিনটি— খাবার এবং অক্সিজেনের অভাব। সেই সঙ্গে রয়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। সত্যেনবাবুর বলেন, 'আমি চাল আর আলু নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার দিন কেটেছে ভাত আর আলুর চোখা খেয়ে। কিংবা নুড্‌লস।' সত্যেনবাবু আরও বলেন, 'লাদাখের রাস্তাঘাট এতই খারাপ যে জিনিসপত্র রিকশয় চাপিয়ে নিয়ে যাব তার উপায় নেই। খালি রিকশ নিয়ে কিছুদূর গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। তারপর মালপত্র নিয়ে হেঁটে যেতাম রিকশ পর্যন্ত।'

নিঃসন্দেহে এইভাবে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাচলা করা রীতিমতো কঠিন। কিন্তু কীসের জন্য এই কষ্ট স্বীকার? শুধুই কি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য? অবশ্যই না। সত্যেনবাবুর উদ্দেশ্য, পরিবেশবান্ধব যানবাহন হিসেবে সাইকেলরিকশকে জনপ্রিয় করে তোলা। সেই সঙ্গে তিনি চেয়েছেন দীর্ঘ যাত্রাপথে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে।

পথে নানারকম বিপদ দেখে ভয় করেনি? কিংবা ক্লান্ত লাগেনি কখনও? এবারও সত্যেন দাস মাথা নাড়েন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'এটা ঠিক, দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দেওয়া মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর। সময়ও লাগে বিস্তর। কিন্তু আপনি যত এগোবেন হিমালয়ের অপার্থিব সৌন্দর্য আপনার সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে। শুধু ক্লান্তি কেন, জীবনের কোনও দুঃখ বা অপমানের কথাও আপনার মনে থাকবে না।'

সাভারকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

পুস্তক প্রসঙ্গ

কোহানা রায়

বিনায়ক দামোদর সাভারকার। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক ব্রাত্য বিপ্লবী। নিজের সমগ্র জীবনটি যিনি উৎসর্গ করে গিয়েছেন দেশের কাজে, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার কল্পে— সেই বিনায়ক দামোদর সাভারকারকেই তাঁর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেননি এদেশের বামপন্থী এবং তথাকথিত সেকুলার ইতিহাসবিদরা। বরং, দেশমাতৃকার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানটি সম্পর্কে অনবরত কুৎসা রটিয়ে গিয়েছেন তারা। মিথ্যা এবং বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাভারকার সম্পর্কে। আর এই ঘৃণ্য কাজে ক্রমাগত মদত দিয়ে গিয়েছে এবং দিচ্ছে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। ফলে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সাভারকার বরাবরই অজানা রয়ে গিয়েছেন। অথচ, রুশ বিপ্লবের নায়ক ভ্লাদিমির লেনিন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, কার্ল মার্কসের নাতি জাঁ লঁগেত, সমাজতান্ত্রিক নেতা জাঁরেম, আয়ারল্যান্ডের চরমপন্থী নেতা গাই অ্যালফ্রেড, নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ড, ইংরেজ কবি উইলফ্রিড ব্লান্ট এই সাভারকারকেই বসিয়েছেন সম্মানের আসনে। অথচ এদেশে রাহুল গান্ধী থেকে কানহাইয়া কুমারের মতো কিছু ইতিহাস অনভিজ্ঞ, ধান্দাসর্বস্ব রাজনৈতিক নেতা এখনও সাভারকারকে কালিমালিপ্ত করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস আড়াল করতে চাইছেন দেশের মানুষের কাছ থেকে।

ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করা এবং একজন দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে কুৎসা রটানো বন্ধ করতে দরকার ছিল সাভারকার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা। সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করেছেন সুদীপ দাস তাঁর 'সাভারকার সামাজিক আন্দোলন ও কানহাইয়া প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থটি দেশের তরুণ সমাজকে সাহায্য করবে সাভারকারকে চিনে নিতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সাভারকার আন্দামানে অমানুষিক অত্যাচারের ভিতর চোদ্দ বছরের বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। আর তেরো বছর থেকেছেন অন্তরীণ। আন্দামানে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে ইলেকট্রিক ব্যাটারির ছেঁকা। হাত-পা-কোমরে লোহার-বেড়ি শিকল নিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর সমস্ত পারিবারিক সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়েছে সরকার। তবুও তাঁকেই 'দেশদ্রোহী'র কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন নেহরুপন্থী, বামপন্থী এবং সেকুলাররা।

রাহুল গান্ধী এবং কানহাইয়া কুমারের মতো রাজনীতিকরা প্রায়ই বলেন, সাভারকার ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের এই কথাটি হচ্ছে, স্বল্প ইতিহাস জেনে ইতিহাসকে বিকৃত করার এক জঘন্য প্রয়াস। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সাভারকার ছিলেন একজন বিপ্লবী। আন্দামানের কারাগারে তাঁকে অশেষ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তিনি ব্রিটিশ সরকারের আতিথেয়তায় কোনও

নিরুপদ্রব বন্দি জীবন যাপন করেননি। যাঁরা বলছেন সাভারকার ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন— তাঁরা হয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানেন না, বা জানলেও বলেন না। মনে রাখতে হবে, সাভারকারের মতো একজন বিপ্লবী সারাজীবন কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। বরং ছলেবলে কৌশলে কারাগারের বাইরে এসে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়াই তাঁর কাম্য ছিল। যে কারণে, বন্দি সাভারকার জাহাজ থেকে পালাতেও চেয়েছিলেন। সাভারকার যখন ব্রিটিশ কারাগারে বন্দি, তখন তাঁকে মুক্ত করার ছক সাজিয়েছিলেন তাঁর সতীর্থ বিপ্লবীরাও। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ড. চম্পারণ পিল্লাই, অবিনাশ ভট্টাচার্যদের উদ্যোগে এবং জার্মানির মদতে ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স লিগ গঠিত হয়। এই লিগ জার্মানির কাইজারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিকল্পনা করেছিল যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত তিনটি জাহাজ ভারতে পাঠানো হবে। তারা আন্দামান আক্রমণ করে সেলুলার জেল থেকে সাভারকারকে মুক্ত করে আনবে। সে পরিকল্পনা সফল হয়নি। কারণ, ব্রিটিশ আগে থেকেই তা জেনে ফেলে।

যাঁরা সাভারকারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান তাঁরা জানেন না যে, গাই অ্যালফ্রেড, উইলফ্রিড ব্লান্ট, অস্কার ওয়াইল্ডের মতো বিশ্ববন্দিত লেখক, কবি, সাংবাদিক, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতারা তখন সাভারকারের মুক্তির দাবিতে জনমত সংগঠিত করেছেন। যদি সাভারকারের সমালোচকরা ইতিহাস পাঠ করতেন, তাহলে বুঝতেন 'মার্সি পিটিশনে'র ছলে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেও সাভারকার বিপ্লবের পথ ছাড়েননি। আন্দামান থেকে মুক্তি পেলেও তেরো বছর অন্তরীণ থেকেছেন। এই অন্তরীণ অবস্থাতেই বিপ্লব প্রয়াসে তিনি নিজেকে জড়িত রেখেছেন। জাপান থেকে রাসবিহারী বসু তাঁর কাছেই অনুরোধ করেছেন— ভারত থেকে এমন একজন কাউকে পাঠাতে যিনি জাপানে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সাভারকার বেছেছেন সুভাষচন্দ্রকে। সাভারকারের পরামর্শে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়েছেন জার্মানি। তারপর বাকিটুকু তো ইতিহাস।

এই গ্রন্থটিতে সাভারকারের বিপ্লবী জীবনের পাশাপাশি তাঁর সামাজিক আন্দোলন এবং অবদানের প্রসঙ্গটিও এসেছে। গান্ধী এবং সাভারকারের তুলনামূলক বিচারে লেখক দেখিয়েছেন, গান্ধী চরিত্র যখন বারংবার পরস্পরবিরোধিতায় আক্রান্ত হয়েছে, তখন সাভারকার তাঁর কর্মে এবং নিষ্ঠায় ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য এবং সংগ্রহযোগ্য।

সাভারকারের সামাজিক আন্দোলন ও কানহাইয়া প্রসঙ্গ। লেখক : সুদীপ দাস। প্রকাশক : হিন্দু মহাসভা প্রকাশন। দাম : ৩৫ টাকা।

এই সময়

ত্রয়োদশবর্ষীয়

জার্মানির রেনে শোয়েন শখের পুরাতত্ত্ববিদ। ১৩ বছরের লুকা মালাসচিনটসচেংকো তার

ছাত্র। দু'জনের চেষ্টায় সন্ধান পাওয়া গেছে ডেনমার্কের রাজা হেরাল্ড ব্লুটুথের গুপ্তধনের। রুজেন দ্বীপের উত্তরাংশে মাটির নীচে গুপ্তধনের সন্ধান মেলে।

তুঙ্গে বৃহস্পতি

মদ্যপান করে গাড়ি চালালে কী হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল চীনে। এক যুবক

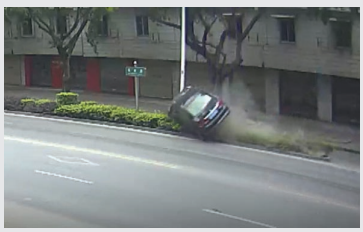

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারান। ধাক্কা মারেন ডিভাইডারে। কিছুক্ষণের জন্য গাড়িটিকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখা যায়। ভাগ্য ভালো, যুবক অক্ষত।

গাড়িতে বাজি

গাড়িতে বাজি ছিল। চীনের হাইওয়ে দিয়ে হাওয়ার গতিতে ছুটছিল গাড়ি। হঠাৎই দেখা

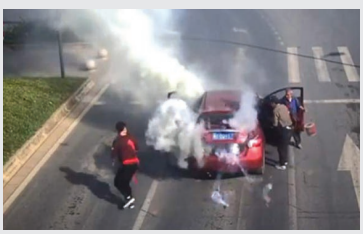

গেল গাড়ির ভেতর আলোর তীব্র ঝলকানি। সেইসঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ। যাত্রীদের সিগারেটের আগুন উড়ে এসে বাজিতে লাগার ফলে বিপত্তি। কেউ হতাহত হননি।

সমাবেশ -সমাচার

ধর্মজাগরণের সমন্বয় বৈঠক

বর্ধমান জেলার কাটোয়াতে জেলার ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের পক্ষ থেকে দু' দিনের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ শুরু হয়েছিল। উক্ত বর্গে কাটোয়া ও কালনার বিভিন্ন স্থান থেকে মোট ৩৫ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাদের পথনির্দেশ দেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক অরবিন্দ দাস, অধ্যাপক বিশ্ববন্দিত সরকার, প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা, ভাণ্ডারডিহি তপোবন আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী সোমনাথ ব্রহ্মচারী, অগ্রদীপ কপিলমুনি আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী হিরণ্ময়নন্দ মহারাজ, স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী ও

উদ্যোগপতি ননীগোপাল সিংহ প্রমুখ। বর্গের পুরো ব্যবস্থায় ছিলেন কৌশিক দাশগুপ্ত। সংশ্লিষ্ট এলাকার গরিব হিন্দুদের খ্রিস্টানীকরণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করা হয়। সেই সঙ্গে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বুঝিয়ে পুনরায় তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্যও বলা হয়।

সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার বর্ষপ্রতিপদ উৎসব

৫১২০ যুগাব্দের শুভ নববর্ষ ও সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব রাও হেডগেওয়ারজীর পুণ্য জন্মতিথি পালন করে গাজোল সংস্কার ভারতীর সদস্য-সদস্যারা। দীপ প্রজ্জ্বলন পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এদিনে সমবেত সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলান মন্দিরা সরকার, পুষ্প সরকার, পার্থপ্রতিম সরকার, পরেশ চন্দ্র সরকার, অজয় নন্দী ও চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী, তবলায় সঙ্গত করেন সুব্রত বিশ্বাস। অতি সুন্দর একটি আবৃত্তি উপহার দেন অনুপম বর্ধন। বর্ষপ্রতিপদ ও ডাক্তারজীর উপরে বক্তব্য রাখেন পরেশ চন্দ্র সরকার। শেষে বেতার ও দূরদর্শন খ্যাত শিল্পী জয়া চক্রবর্তীর গান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও রাষ্ট্রবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সারদা শিশু নিকেতনের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মালদহ জেলার গাজোল থানার হরিপুরে শ্রীমতী দৈবকী দেবী সারদা শিশু নিকেতনে গত ২২ মার্চ বিকালে পালিত হলো বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব। সভাপতিরূপে উপস্থিত

এই সময়

২০৯৮

কানাডার লাইব্রেরি এবং আর্কাইভ দপ্তর মাইকেল ড্যাগকে সবিনয়ে জানিয়েছে

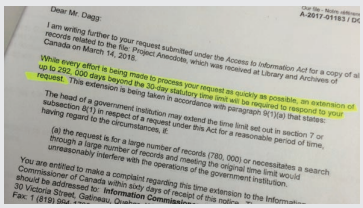

Our file - Notre référence
A-2017-01183 / DC

Dear Mr. Dagg:

I am writing further to your request submitted under the *Access to Information Act* for a copy of al records related to the file: Project Anecdote, which was received at Library and Archives of Canada on March 14, 2018.

While every effort is being made to process your request as quickly as possible, an extension of up to 292, 000 days beyond the 30-day statutory time limit will be required to respond to your request. This extension is being taken in accordance with paragraph 9(1)(a) that states:

The head of a government institution may extend the time limit set out in section 7 or subsection 8(1) in respect of a request under this Act for a reasonable period of time, having regard to the circumstances, if:

(a) the request is for a large number of records (780, 000) or necessitates a search through a large number of records and meeting the original time limit would unreasonably interfere with the operations of the government institution.

You are entitled to make a complaint regarding this time extension to the Information Commissioner of Canada within sixty days of receipt of this notice. ... should be addressed to: **Information Commission...** 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec ... Fax: 1 (819) 994-17...

গবেষণার জন্য তিনি যেসব তথ্যের আবেদন করেছেন সেগুলির ব্যবস্থা করতে দপ্তরের আট দশক সময় লাগবে। মাইকেল যদি ২০৯৮ সালে আসেন তো ভালো হয়।

কার কুকুর

টিনা ওয়াকার এবং ডেভিড সমারভিল ফ্লোরিডার একই আবাসনের বাসিন্দা। কিন্তু

ল্যাব্রেডর জাতীয় একটি কুকুরের মালিকানা নিয়ে তাদের ঝগড়া এখন তুঙ্গে। সম্প্রতি তারা আদালতের শরণাপন্ন হন। বিচারক জানায় দুজনের তত্ত্বাবধানেই থাকবে কুকুরটি।

ঝড়ে উড়ে যায়

মানুষকে কত বিপদেই না পড়তে হয়। ম্যাঞ্চেস্টারের ড্রয়েলসডেনের এক ট্র্যাভেল

এজেন্সির অফিসের কর্মীদের ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে কেটে পড়েছিল এক যুবক। কিন্তু অফিস থেকে বাইরে বেরনো মাত্র সে ঝড়ের কবলে পড়ে। ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে গেছে তার হাতে ধরা সব টাকা।

সমাবেশ -সমাচার

ছিলেন বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা তারাপদ সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন পরেশ চন্দ্র সরকার। বিশেষ অতিথি সুশীল চন্দ্র মণ্ডল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সনাতন বা বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ইসকন-এর দৈবকীনন্দন। তাঁর পূর্ব নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, যিনি আগে এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দীপ প্রজ্জ্বলন ও মাতৃবন্দনা হয়। তারপর শিশু শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি, গান, নৃত্য পরিবেশন করে। বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি পরেশ চন্দ্র সরকার ও বিশেষ অতিথি সুশীল চন্দ্র মণ্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।

হুগলীতে রক্তদান শিবির

গত ৩০ মার্চ হুগলির চকবাজার 'বন্দেমাতরম ভবনে' সমাজ সেবা ভারতী হুগলির উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত উদ্বোধন করে বলেন যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ

হয়েছিলেন। আজ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্তদান সমাজের জন্য এক যোগ্য কাজ। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ রমাপদ পাল, হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক বীরেন্দ্র কুমার পাল, সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদিকা শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ প্রমুখ। রক্তদান শিবির সম্পাদনা সমিতির সম্পাদক বিতান কিশোর পাল জানান যে ৭৪ জন উৎসাহী রক্তদানে নাম নথিভুক্ত করেন।

সঙ্ঘের কলকাতার পূর্ব বিভাগের রক্তদান শিবির

গত ১ এপ্রিল, সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর পূর্ব বিভাগের বার্ষিক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর উদ্‌যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজনে সহায়তা করেছে বেলেঘাটার অগ্রণী ক্লাব। ক্লাবের নিজস্ব ভবনে আয়োজিত এই শিবিরে স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে ক্লাবের কর্মকর্তারা সক্রিয় সহযোগিতা করেন। সকাল থেকেই শিবিরকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সঙ্ঘের অন্যান্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় শারীরিক টোলির সদস্য শ্রী রামচন্দ্র পাণ্ডে। তিনিও রক্তদান করেন।

এই সময়

ইরাকে জঙ্গির শাস্তি

শেষমেশ ইসলামিক দেশগুলিও জঙ্গিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া শুরু করল। সম্প্রতি ইরাকে

১৩ জন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১১ জন জেহাদি। এরা প্রত্যেকেই জঙ্গি সংগঠন আইএসের সঙ্গে যুক্ত। ইরাকের আইন মন্ত্রক সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে।

ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ

সম্প্রতি কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দীনেশ গুন্ডুরাও উত্তর

প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্বন্ধে অপমানজনক মন্তব্য করেন। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে ভোক্কালিগা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের নেতারা গুন্ডুরাও-এর পদত্যাগ দাবি করেন।

শস্তা বাজার

পাইকারি বাজারে মুদ্রাস্ফীতির হার ২.৪৮

শতাংশে নেমে এসেছে। এর ফলে শাকসবজি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম কিছুটা হলেও কমবে। গত বছর মার্চ মাসে পাইকারি বাজারে আনাজপত্রের দামে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৫.১১ শতাংশ। বর্ষা ভালো হলে মুদ্রাস্ফীতি আরও কমবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সমাবেশ -সমাচার

কোচবিহারে বিবেকতীর্থ দ্বারোদঘাটন

সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নবনির্মিত কোচবিহার জেলা কার্যালয়ের বিবেকতীর্থের শুভ দ্বারোদঘাটন হলো গত ১৮ মার্চ। দ্বারোদঘাটন করলেন অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। এই উপলক্ষ্যে বিগত দিনে কোচবিহার জেলার প্রচারক জীবন কাটিয়ে যাওয়া প্রায় ৩০ জন বরিষ্ঠ প্রচারককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। জেলার সাধারণ স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড়েঠাসা এই অনুষ্ঠানের ছোট্ট আয়োজন হয়ে উঠেছিল প্রকৃতই মনোগ্রাহী ও আবেগঘন এক পুনর্মিলন

অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করেন সুনীলপদ গোস্বামী, বলরাম দাস রায়, উদয়শংকর সরকার ও অজিত পাল প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষণ দেন অদ্বৈতচরণ দত্ত। সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে মনোগ্রাহী এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন ব্যবস্থাও ছিল।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life

আধ্যাত্মিক জাতীয়তাই বাংলায় প্রচার করছে স্বস্তিকা —ইন্দ্রেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'স্বস্তিকা কোনো সাংসারিক নাম নয়, স্বস্তিকা হলো একটি আধ্যাত্মিক নাম, এই পত্রিকার আধ্যাত্মিকতা বাংলায় জাতীয়তার প্রচারে সহায়ক হবে।' স্বস্তিকা পত্রিকার সত্তর বছর উপলক্ষে আয়োজিত নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচনে এসে গত ১৪ এপ্রিল সুবর্ণবণিক সমাজ ভবনে এমনই কথা বললেন রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের সর্বভারতীয় সংযোজক ইন্দ্রেশ কুমার। এদিন প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে পঞ্চম স্বস্তিকা সম্মান প্রদান করা হয় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসকে। স্বস্তিকার সত্তর বছর উপলক্ষে বাংলার সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কানায় কানায় পূর্ণ সুবর্ণ বণিক সমাজের প্রেক্ষাগৃহে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে স্বস্তিকার প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেন যে সূচনালগ্ন থেকে স্বস্তিকার যাত্রাপথ সুগম ছিল না। কিন্তু সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বস্তিকা শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিকে পরিণত হয়েছে।

স্বস্তিকা সম্মানে দৃশ্যতই আপ্লুত লাগছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অচিন্ত্য বিশ্বাসকে। তিনি সংস্কার ভারতীর একটি গানের সূত্র ধরে হিন্দুমেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কমিউনিস্ট জেহাদি যোগেই ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ইন্দ্রেশ কুমার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ছাব্বিশ হাজার সেনানীর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কথা। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ভারত ছিল এক পতাকা, এক দেশ, এক সংবিধান ও এক নাগরিকের। কিন্তু

রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী ড অচিন্ত্য বিশ্বাসকে 'স্বস্তিকা সম্মান' প্রদান করছেন। ছবি : শিবু ঘোষ

স্বস্তিকা নববর্ষ (১৪২৫) উন্মোচন করছেন রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। ছবি : ভা. নীতেশ রাই।

নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করে একদেশে বিভাজন ঘটিয়ে দুই পতাকা, দুই সংবিধান ও দুই নাগরিকের দেশ গড়ে তুলেছে। দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে স্বস্তিকা এই বিভেদের বিরুদ্ধে কলম ধরছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৭ দেশের স্বাধীনতার বছর নয়, এটি দেশভাগের বছর। ক্ষুদিরাম, সুখদেব, ভগৎ সিংহ বা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো বীরাঙ্গনারা এই দেশ দেখতে চেয়ে আত্মত্যাগ করেননি। রাজ্যপালের লিখিত ভাষণে উঠে এসেছিল স্বাধীন ভারতে শরণার্থী স্রোত ও অনুপ্রবেশ সমস্যার কথা। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তার স্বরকে স্বস্তিকা উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। রাজ্যপাল এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার পাশাপাশি স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যারও উন্মোচন করেন। তাঁর হাতে নববর্ষ সংখ্যা তুলে দেন পত্রিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য।

শ্রী আঢ্য তাঁর ভাষণে রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি বিগত বছরগুলিতে মসৃণভাবে স্বস্তিকা পরিচালনার জন্য লেখক, পাঠকদের সঙ্গে স্বস্তিকার প্রচার-বন্ধুদেরও বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। সবার মিলিত উদ্যোগে স্বস্তিকা পরিবাররূপে আগামীদিনে বাংলা সংবাদ জগতে নতুন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এদিন উদ্বোধন হয় স্বস্তিকার ডিজিটাল সংস্করণের। প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ডিজিটাল স্বস্তিকা আজকের ই-দুনিয়ায় পাঠকের আরও কাছে পৌঁছে যাবে বলে জানান অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর বেহালা শাখার শিল্পীবৃন্দ। ■

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ। ছবি : জয়রাম মণ্ডল।

হিন্দু সন্ত্রাসের মনগড়া তত্ত্ব আদালতে খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ১১ বছর আগে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণে জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ ও আরও পাঁচজনকে বেকসুর খালাস দিল বিশেষ এন আই এ আদালত।

সংশ্লিষ্ট বিচারক তাঁর রায়ে জানান অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির মধ্যে একটিও প্রমাণিত হয়নি। এই কারণে সকলকেই তিনি অভিযোগমুক্ত হিসেবে গণ্য করে মুক্তি দিলেন। অভিযুক্তদের তরফের আইনজীবী জেপি শর্মা আদালতের এই রায় সংবাদ মাধ্যমকে জানান।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের ১৮ মে বিস্ফোরণ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে পুলিশের গুলিতে উন্মত্ত জনতার মধ্যে ৫ জন মারা যান। এরপর এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা সিবিআই-এর হাতে যায়। সিবিআই পরবর্তীকালে চার্জ সিট দেওয়ার পর ২০১১ সালে সিবিআই-এর কাছ থেকে মামলা এন

স্বামী অসীমানন্দ

আই এ (ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি)-র কাছে হস্তান্তরিত হয়।

এই সূত্রে তদান্তীন কংগ্রেস সরকার ১০ জনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়ে সন্ত্রাসী কাজকর্মে মদত দিয়ে বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনে। এদের মধ্যে লোকেশ শর্মা, স্বামী অসীমানন্দ ওরফে নবকুমার সরকার, দেবেন্দ্র গুপ্তা, ভরত মোহনলাল বতেশ্বর ওরফে ভরতভাই ও রাজেন্দ্র চৌধুরী গ্রেপ্তার হন।

এই মালায় এন আই এ সর্বসাকুল্যে ২২৬ জন সাক্ষীর বয়ান লিপিবদ্ধ করে ও ৪১১টি নথি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করে। প্রসঙ্গত স্বামী অসীমানন্দ ও ভরতভাই ইতিমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন, বাকিরা এখনও জেলে ছিলেন। এই রায় ঘোষণার পর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে হিন্দু সন্ত্রাসের মিথ্যে তত্ত্ব তুলে ধরার অপরাধে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার দাবি করা হয়েছে।

উল্লেখিত রায় ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি আইনজীবী অলককুমার আদালতের এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, এর ফলে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের তরফে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের যে মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল তা নস্যাৎ হয়ে গেল।

সোনিয়া, রাহুল ক্ষমা চান : সম্বিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মক্কা-মসজিদ বিস্ফোরণ রায়ে স্বামী অসীমানন্দ-সহ পাঁচজন বেকসুর খালাস হয়ে যাওয়ায়, কর্ণাটকে ভোটের মুখে বেজায় বেকায়দায় পড়েছে কংগ্রেস। এই রায় বেরনোর পরই বিজেপি এই ইস্যুতে চেপে ধরেছে কংগ্রেসকে। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, কংগ্রেস যে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের কথা বলে, এখন প্রমাণ হয়ে গেল তা মিথ্যা। হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বলে আসলে কিছু হয় না। বরং মুসলমান তোষণের লক্ষ্যে হিন্দুদের ওপর যে মিথ্যা অভিযোগ এনে আক্রমণ চালিয়েছিল কংগ্রেস সরকার— আজ তার পরদা ফাঁস হয়ে গেল।

বলা দরকার, কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল শিন্ডে প্রথম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী-সহ তাবৎ কংগ্রেসিনেতা 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এমনকী, দেশের ভাবমূর্তির তোয়াক্কা না করেই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে রাহুল বলেছিলেন, 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদই দেশের সামনে সবথেকে বড় বিপদ।' কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারেও কংগ্রেস বারবার এই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদের' উল্লেখ করেছে। মক্কা মসজিদ মামলার রায় বেরনোর পরই বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করেছেন।

সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'কংগ্রেসের কথাবার্তা সম্পূর্ণ দ্বিচারিতায় ভরা। টু জি মামলার রায় বেরনোর পর কংগ্রেস বলেছিল আদালত ঠিক রায় দিয়েছে। আর এখন বলছে, ঠিকমতো বিচার হয়নি।' সম্বিত বলেন, 'কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ জানিয়েছিলেন বাটলা হাউসে জঙ্গিদের মৃতদেহ দেখে সোনিয়া গান্ধী নাকি কেঁদেছিলেন। তিনদিন ঘুমোতে পারেননি। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব আর বি এস মানি বলেছেন, কংগ্রেসের সময়ে ফাইল বদল করা হতো। গেরুয়া সন্ত্রাসের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চিদম্বরমরা এটা করতেন। সোনিয়া ও রাহুলের বিন্দুমাত্র সততা থাকলে এখন তাঁরা ক্ষমা চান।'

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়াকেও একহাত নিয়েছেন সম্বিত। বলেছেন, 'সিদ্ধারামাইয়া বলতেন তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না। আর এখন বলছেন তাঁর নামে রাম আছে। কংগ্রেসের এসব ভাঁওতা আর তোষণের রাজনীতি বেশিদিন চলবে না। কর্ণাটকের মানুষই এর জবাব দিয়ে দেবে।'

সোনার প্রতি মানুষের টান প্রাগৈতিহাসিক

শেখর সেনগুপ্ত

পাথর বসানো একটা ছোট্ট আংটি। এক চিলতে সোনা দিয়ে তৈরি। তার দাম পাঁচ হাজার টাকা। দাম শুনে চোখ আমার চড়কগাছ। পকেটে যত টাকা আছে, তাতে কুলাবে না। মন খারাপ করে ফিরে এলাম বাড়িতে। তখনই মনে হলো, যে ধাতুর অত চড়া দাম, তার পুরানো ইতিহাসকে নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত। ইতিহাসের পথ ধরে তাই কেবল পিছিয়েই যাচ্ছি। হাজার হাজার বছরের পথ। এভাবেই জানা গেল যে, ধাতুদের মধ্যে সোনাকেই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করে। আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে আদিম মানুষ সোনা দিয়ে ছোট ছোট গহনা তৈরি করত নিজেদের সাজাবার জন্য। মানুষ তখন সোনা কোথা থেকে পেত? তারা সোনার কুচি খুঁজে আনত সমুদ্র ও নদীর বালুবেলা থেকে। সোনার কুচিগুলোকে মোটামুটিভাবে জোড়া লাগাবার কৌশল বের করতে পেরেছিল। সময় খুব জোরে ছোটে। মানুষের মধ্যে নানান রকমের সংস্কার বাসা বাঁধে। কিন্তু সোনার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে তো নাই-ই, বরং বাড়তে থাকে। সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সেটা হলো এই যে, অন্যান্য ধাতুগুলি জল-বাতাসের সংস্পর্শে এলে ধীরে ধীরে বিবর্ণ হতে থাকে। সোনা কিন্তু তা হয় না। সে যেমন ছিল, তেমনটিই থেকে যায়। তার প্রসাদগুণ এতটুকু কমে না। তবে সোনার পরিমাণ দুনিয়ায় বেশ কম, যদিও সব দেশেই কম-বেশি সোনা মেলে। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও মানুষ আজ অবধি কতটা সোনাই বা জোগাড় করতে পেরেছে? সোনার লোভে এক দেশের মানুষ অন্য দেশে কতবার হানা দিয়েছে! এসব তথ্য ইতিহাসে আছে। আমাদেরই একজন খুব প্রিয় লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এই নিয়ে একখানা উপন্যাসও লিখেছেন। নাম 'সূর্য কাঁদলে সোনা'। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সবচেয়ে বেশি টান ছিল সোনার প্রতি। তারা যেখানে যতটুকু সোনা পেত, নিয়ে এসে রাখত নিজের হেপাজতে। এইভাবে গোছাতে গোছাতে এক-একজনের কাছে যে পরিমাণ সোনা জমে যেত, আজকের বাজারে তার দাম অনেক অনেক।

এই রকম সংগৃহীত সোনা ও সোনার গহনার একটা ভাণ্ডার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে ফ্রান্সে। সাত হাজার বছর আগের তৈরি সেই গহনাগুলির মধ্যে রয়েছে সোনার পুঁতি। সোনার মালা। মিশরে রাজপরিবারের শাসন শুরু হবার দু' হাজার বছর আগেও মানুষ সোনার অলঙ্কার পরত। সেই অলঙ্কারগুলি আজও আলোতে আনলে নতুনের মতো ঝলমলিয়ে ওঠে। প্রাচীন ক্রীটের মিনোয়ান সভ্যতার অনেক নিদর্শন আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি মাটি খুঁড়ে। এদের মধ্যে রয়েছে হরেক রকমের ছোটবড় স্বর্ণালঙ্কার। আমাদের দেশের মহেঞ্জদড়ো সভ্যতায় যে সমস্ত অলঙ্কার ব্যবহার করা হতো, তাদের মধ্যে সোনার অলঙ্কারও আছে। সেইগুলির বয়সও পাঁচ হাজার বছরের বেশি।

সিন্ধু সভ্যতার স্বর্ণালঙ্কার।

ছত্তিশগড়ে সোনার খনি।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

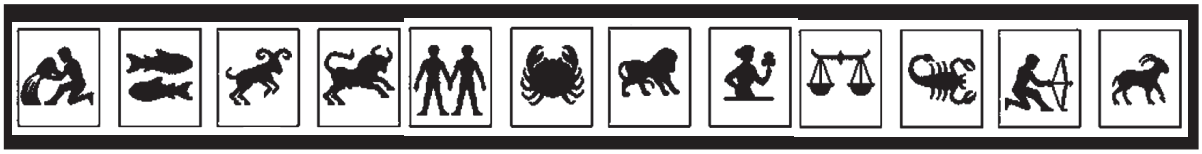

২৩ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ২৯ এপ্রিল (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বৃষে শুক্র, কর্কটে চন্দ্র রাহু তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে মঙ্গল, বক্রী শনি, মকরে কেতু এবং মীনে বুধ।

রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে, পুষ্যা থেকে তুলায় চিত্রা নক্ষত্রে।

মেষ : সপ্তাহের প্রথমদিনে ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান, বিকালে পরিচিত মহলে সাধুবাদ প্রাপ্তি। বস্ত্র ও ঔষধ ব্যবসায়ীর শুভ, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গলাভ, প্রবাস। সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রকাশ, ভ্রাতা ভগিনীর সার্বিক শুভ। বুদ্ধিমত্তায় যাত্রাজয়ী, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ।

বৃষ : শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসনা, মিত্র সমাগম। মাতৃ আরাধনা, গৃহসুখ, ভ্রমণে আনন্দ। জ্ঞানের উন্মেষ, উদ্ভাবনী শক্তির সাফল্য। বিষয়-সম্পত্তি, স্বজনদের সম্পর্কের উন্নতি, বিলাস-ব্যাসনে তৃপ্তি। নিকটবর্তী ভ্রমণ, প্রতিবেশীর সাহচর্যে তৃপ্তি। বাস্তবসম্মত চিন্তা ও তার বাস্তবায়ন।

মিথুন : উৎসাহজনক সংবাদ প্রাপ্তি, পরিবারে সদস্য বৃদ্ধি। লেখক-কলাকুশলীর মনোবাঞ্ছা পূরণ। আয়-ব্যয় সমতা রাখা কঠিন, স্ত্রী/স্বামীর শরীরের যত্নের প্রয়োজন। গৃহে দেবপূজা তথা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সার্বিক সাফল্য। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ। শরীর ও মন সমবেদনায় ভরপুর, অংশীদারী ব্যবসায় মিশ্রফল যোগ।

কর্কট : উচ্চাভিলাষীর ছল-চাতুরী বিষয়ে সতর্ক ও সংযমী হওয়া দরকার। অতিরিক্ত দায়িত্বে মানসিক চাপ, মিত্রস্থান হিতকারী নয়। নিম্নাঙ্গের পীড়া, ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা। বাহন ও সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ। ভ্রমণ বাতিলে মনোকষ্ট। স্ত্রীর অলঙ্কার ও সন্তানের নিযুক্তি।

সিংহ : অর্থ প্রাপ্তি হলেও পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি জটিলতা উদ্বেগের কারণ। বিবাহ ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রশস্তি। কর্মে উৎসাহ ও উন্নতি। নিজ যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থীদের ও আত্মীয়ের শুভ। গৃহসুখ বিনষ্ট। পিতার হার্ট অথবা বক্ষ পীড়া।

কন্যা : বুদ্ধিমত্তায় কার্যসিদ্ধি। একাধিক উপায়ে অর্থ আয়। গৃহকর্তার উদাসীনতায় পারিবারিক তিক্ততা। বহুবিধ ব্যঞ্জনের সমাহার। যান, ঔষধ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ। সন্তান-সন্ততির সাফল্য। গুণীজনের সান্নিধ্য। দন্তপীড়া। গৃহপতির স্বজন-বান্ধবের কারণে মনোকষ্ট। তবে বিদ্যার ক্ষেত্রে শুভ।

তুলা : শিক্ষক, সাংবাদিক, পুরোহিতদের শুভ। পুত্রের ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও মেধার প্রকাশ। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। বিবাহের কথাবার্তায় অগ্রগতি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা। বৈষয়িক বিবাদ।

বৃশ্চিক : সঠিক পদক্ষেপ ও সাফল্য প্রাপ্তি। বাক্-সংযম সাফল্যের চাবিকাঠি। গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও মিত্রের হিতোপদেশ। পিতার ব্যবসায় বিনিয়োগ। অতিরিক্ত আবেগ বিড়ম্বনার কারণ। খেলোয়াড়, পুলিশ, কুস্তিগীরের শুভ।

ধনু : সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধি। সুনাম, অর্থাগমের সম্ভাবনা, ক্লান্তি-অবসাদ ও স্বস্তি-আনন্দ। অনিয়ম, শিরঃপীড়া। কীটপতঙ্গ থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান ও দেবার্চনায় ভক্তি। শ্রমের মর্যাদা ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ।

মকর : বাহন যোগ, আবেগঘন মন। শরীরের যত্নের প্রয়োজন। গৃহে সামাজিক মেলবন্ধন। হঠাৎ বাধা ও ব্যয়। কর্মের যোগসূত্রে ভ্রমণ ও আনন্দ। অংশীদারী ব্যবসা ও অধস্তনদের সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রাখুন। নতুন কোনও আশাপ্রদ সংবাদ প্রাপ্তি।

কুম্ভ : দুর্ভাবনায় স্বাস্থ্যহানি। ব্যবসায়ীর শুভ। সরলতার পূর্ণ মূল্যায়ন না হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। উৎসাহের অভাব, সময়ের অপচয়। সামাজিকতা ও সংস্কারে সুনাম, পারিবারিক পুনর্মিলন ও গৃহের শ্রীবৃদ্ধি।

মীন : সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরাগতা। মহিলা প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা দরকার। অতৃপ্তভাব ও কটু মন্তব্য। স্বজন বিরোধ ও কর্মহানি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের শুভ। লিখিত কর্মে সতর্ক থাকা দরকার। সামাজিক ও সৃজনশীল কর্মে প্রশস্তি।

শ্রী আচার্য্য